Chandmama

December 1993

Bengali issue

চাঁদমামা

নিয়ন্ত্রক: বি. নাগি রেড্ডি সংস্থাপক: চক্রপাণি

মানব ঐক্যের সোনার নিয়ম

"অপরের প্রতি আমরা সেরকমই ব্যবহার করব ঠিক যেরকম ব্যবহার আমরা তার কাছে আশা করি।" দ্বিতীয় বিশ্ব ধর্মসম্মেলনের মূল আবেদন ছিল এই। একশ বৎসর পূর্বে শিকাগো শহরের যেস্থানে প্রথম বিশ্ব ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে স্থানেই গত সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বিশ্ব ধর্মসম্মেলন। এই মহাসম্মেলন আমাদের কাছে স্মরণীয়; কারণ এই সম্মেলনেই ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন এনে দিয়েছিলেন।

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, শিখ, ইসলাম এবং জরোঅ্যাস্ট্রিঅ্যান—বিশ্বের প্রধান এই ধর্মসম্প্রদায় হতে প্রায় ১২৫ জন প্রতিনিধি বিশ্বের নৈতিক সত্যতা সম্পর্কে ঘোষিত প্রস্তাবনায় সানন্দে স্বাক্ষর করেন। উপরে বর্ণিত উক্তিটির মাধ্যমে সকল ধর্মকেই দেওয়া হয়েছে এক সোনার নিয়ম, সকলেই যেন এর প্রতি অনুগত থাকে।

প্রচারিত ঘোষণায় অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধানের উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, অহিংস নীতি, প্রাকৃতিক বিষয়ে সচেতনতা এবং নারী-পুরুষে ভেদাভেদ বিলুপ্তির মাধ্যমেই তা সফল হওয়া সম্ভব। নয় পৃষ্ঠার ঘোষণাপত্রে কোথাও 'ঈশ্বর' শব্দের ব্যবহার নেই, হয়তো 'সর্বশক্তিমান' রূপে অনেক ধর্মই ঈশ্বরকে মান্য করে না।

মানবজাতির ঐক্যমিলনে স্বামীজীর উক্তির সঙ্গে উপরের উক্তিটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। দালাইলামা দৃঢ়স্বরে বলেন, নৈতিক অনুশাসনগুলো মেনে চললে বিশ্বের বহু সমস্যার সমাধান সহজতর হয়ে উঠবে। কারণ পরস্পর বিশ্বাস এবং মিলনই বিশ্বে স্থায়ী শান্তি আনতে পারে।

দুই সহস্র বৎসর পূর্বে যীশুখ্রীষ্টও বলেছেন, "তাদের তুমি তাই দাও যা তাদের কাছে তুমি পেতে চাও।" দুঃখের বিষয়, আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, যে ধর্মেই হোক অনুশাসন বাক্যগুলোকে মান্য করা অতীব প্রয়োজন।

খণ্ড ২২ ডিসেম্বর '৯৩ সংখ্যা ৬
প্রতি সংখ্যা ৪·০০ বাৎসরিক চাঁদা ৪৮·০০
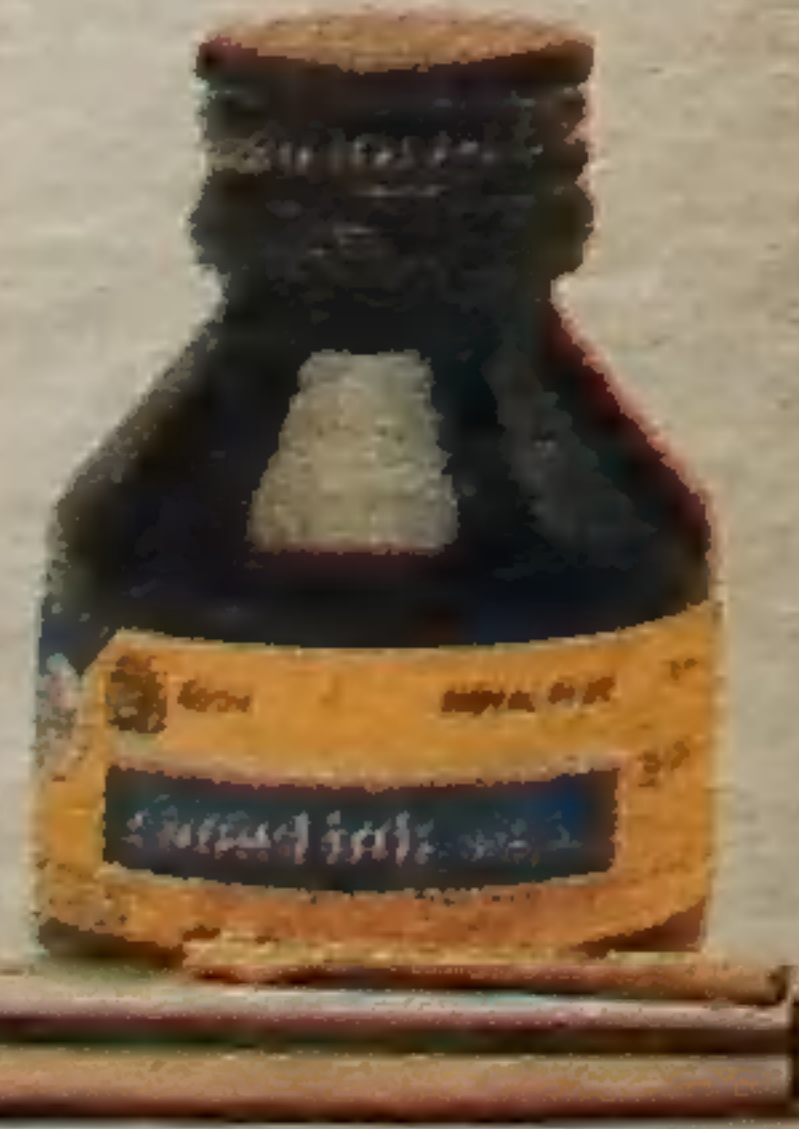
শত্রু এখন বন্ধু

দীর্ঘদিন সংগ্রামরত ইহুদী এবং প্যালেস্টাইনবাসীদের মধ্যে অবশেষে মৈত্রী স্থাপিত হল। ওয়াশিংটনে গত ১৩ সেপ্টেম্বর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতা এবং তাদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে শত্রু-ভাবাপন্ন এই দুই জাতির মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন ইজরাইলের বিদেশমন্ত্রী শিমন পিরেস এবং প্যালেস্টাইন মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান মাহ্‌দ আব্বাস। চুক্তি স্বাক্ষরের পর সহাস্যে করমর্দন করেন ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইজাক রাবিন এবং পি.এল.ও.-র প্রধান ইয়াসের আরাফত।

প্রায় গত চারদশক ধরে ইহুদী এবং আরবদের মধ্যে হিংসাত্মক লড়াই চলে আসছিল, বিশেষত, প্যালেস্টাইন বলে পরিচিত অঞ্চল হতে ইহুদীরা আরবদের বিতাড়িত করার পর থেকে। চুক্তি অনুযায়ী এখন ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এবং গাজা ভূখণ্ডে বসবাসকারী প্রায় ৩০০,০০০ প্যালেস্টাইনবাসী সীমিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ পাবে। আরো ব্যাপকভাবে সমস্যা সমাধানের এটা হচ্ছে প্রাথমিক স্তর এবং আগামী দুই বৎসরে দুই পক্ষই আরো আলোচনা করার জন্য সম্মতি জানিয়েছে।

২২ মাস পূর্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এক প্রস্তাবে বলা হয়, "জেরুসালেম সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার, শরণার্থী ও সীমানা সংক্রান্ত এবং পরস্পর বোঝাপড়ার ব্যাপার হচ্ছে প্যালেস্টাইন এবং ইজরাইলের দায়িত্ব," এবং তারই ফলস্বরূপ এই চুক্তি।

বলা হয়, ২ নভেম্বর, ১৯১৭-এর 'বালফোর' ঘোষণা এই রক্তক্ষয়ী লড়াইকে নিয়ে আসে। সে সময়ে জাতিসঙ্ঘের ঘোষণানুসারে ব্রিটেন প্যালেস্টাইনকে শাসন করত। তদানীন্তন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র বিভাগের সচিব লর্ড আর্থার বালফোর ইহুদীদের জন্য একটি পৃথক ভূমিখণ্ডের কথা ভাবছিলেন। ঘোষণার পূর্বেই

ইহুদীরা বলেছিল, তারা প্যালেস্টাইনে পৃথক ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপনা করতে চায় না, কিন্তু পরবর্তীকালে সমগ্র প্যালেস্টাইনই তাদের বাসভূমি হয়ে যায়। বালফোর কেবল এটুকুই বলেছিলেন, ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে তাদের বাসস্থান পাবে। যাই হোক, ঢেউ-এর মত ইহুদী শরনার্থীর দল এসে দখল করতে শুরু করে প্রকৃতপক্ষে যা তাদের নয় এবং প্যালেস্টাইনবাসী সেখান হতে ক্রমে বিতাড়িত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) শেষে প্যালেস্টাইনে আরবদের তুলনায় ইহুদীদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যায় এবং ইহুদীদের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের আন্দোলন আরো জোরদার হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ইহুদীরাষ্ট্রকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃতি দিয়ে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ দেবার কথা ভাবছে যে সময়ে, সে সময়ে ইহুদীরা এককভাবে ১৪ মে ১৯৪৮-এ প্যালেস্টাইনে ইজরাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টির কথা ঘোষণা করে। এর ফলে প্রবল অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং ১৯৪৮ হতে ১৯৮৮-এর মধ্যে বহুবার আরব-ইজরায়েলি সংঘর্ষ ঘটে। ১৯৬৭ সালে ইজরাইল মিশর, সিরিয়া এবং জর্দানকে পরাজিত করে 'গাজা স্ট্রীপ', সিনাই, সিরিয়ার গোলান হাইটস্ এবং জর্দানের পশ্চিমের ভূখণ্ড অধিকার করে। হারানো ভূখণ্ড ফিরে পাবার জন্য মিশরের সাথে ১৯৭৩-এ ইজরাইলের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়; ইজরাইল সিনাই হতে চলে যায়।

এরমধ্যে পি.এল.ও. একটা সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে, লেবাননের বেইরুটে হয় এদের প্রধান দপ্তর। ১৯৭৮ থেকেই এরা মাতৃভূমির মুক্তির জন্য লড়াই করতে থাকে। টিউনিসিয়া পর্যন্ত পি.এল.ও. সরে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৮৮-তে প্যালেস্টাইনবাসীদের জন্য ওয়েস্ট ব্যাঙ্ককে জর্দান দাবি করে।

১৯৯০ সালে আমেরিকা এবং তদানীন্তন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ইহুদী এবং আরবদের আলোচনার জন্য আহ্বান জানায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এই আবেদনকে সমর্থন করে এবং তৃতীয় দেশ স্পেনে ১৯৯১ সালে আলোচনা শুরু হয়। ২২ মাসের আলোচনায় খুব বেশি ফললাভ হয়নি। পি.এল.ও.-র চেয়ারম্যান ইয়াসের আরাফত নরওয়ের মধ্যস্থতায় ইজরাইল নেতাদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা শুরু করেন। সর্বপ্রথম বাধা দূর করে আরাফত ইজরাইলকে একটি রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে চিঠি দেন। নরওয়ের বিদেশমন্ত্রী ইজরাইলের রাবিনের কাছ থেকে পি.এল.ও.-কে স্বীকৃতিদান-সূচক চিঠি আদায় করেন। সেসময়েই শান্তি-চুক্তির বয়ান তৈরী হয় এবং সমস্ত গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গেলে এর বিরুদ্ধে কিছু ইহুদী এবং আরববাসী তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন প্রধানমন্ত্রী রাবিন এবং আরাফতকে চুক্তিস্বাক্ষর প্রত্যক্ষ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। দুজনের সহাস্য করমর্দন হয়। রাষ্ট্রপতি ক্লিনটন বলেন, "একটা বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। প্রধানমন্ত্রী রাবিন এবং অধ্যক্ষ আরাফত, এই বিজয়ের দিনটি আপনাদের। কিন্তু আগামীকাল তাদের দিন হবে।" এই বলে তিনি ইজরাইল এবং প্যালেস্টাইন শিশুদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখিয়ে দেন যারা ওই মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত ছিল।

শত্রুতারও বিনাশ হয় এবং তা বন্ধুত্বে পরিণত হতে পারে।

ভালমানুষের সৌভাগ্য

গ্রামের নাম রামপুর। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। চাষ-আবাদের সাথে সাথে সেখানে শিক্ষার প্রসারও ঘটেছে। রামপুরের প্রভাব তার আশেপাশে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে।

লক্ষ্মী রামপুর গ্রামেরই মেয়ে। সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। বিবাহের উপযুক্ত বয়স হয়েছে। কলেজের পাঠ সমাপ্ত করেছে। পাশের গ্রামের রাম তার সহপাঠী। রামকে লক্ষ্মীর খুব পছন্দ, ভাল লাগে। তার মতে, রামের মত সহজ, সরল এবং সৎ ছেলে এ-গ্রামে ও-গ্রামে আর কেউ নেই।

গ্রামেরই ছেলে শেখর। বিদ্যালয়-জীবন থেকে চারজনে খুবই বন্ধুত্ব। ইন্দুও তাদের গ্রামের মেয়ে। প্রায়ই তারা চারজনে মিলিত হয়ে বেশ আড্ডা জমায়। মলিনতা নেই বন্ধুত্বে। তবে রামের প্রতি যেমন লক্ষ্মীর একটু দুর্বলতা, শেখরের প্রতিও ইন্দুর সামান্য দুর্বলতা রয়েছে।

রামের প্রতি লক্ষ্মীর মনোভাবের কথা জানতে পেরে শেখর লক্ষ্মীর কাছে একদিন প্রতিবাদের সুরে বলে, "রামকে তোমার এত পছন্দ কিসের? এক নম্বরের বোকা-গাধা। আজকালকার দিনে ওরকম চলে? ভাল-মানুষীতে কাজ হয় না। সবাই ঠকাবে, ঠকবে পদে পদে। ওকে যে বিয়ে করবে, সারাজীবন তাকে কষ্ট করতে হবে। আমাদের মতন কি সে পারবে তার স্ত্রীকে সুখে রাখতে, অসম্ভব।"

শেখরের কথাকে অগ্রাহ্য করে লক্ষ্মী, "রামের বুদ্ধির অভাব কোথায় দেখলে? বুদ্ধি মানে কি কেবল নিজেকে নিয়ে থাকা আর কাজ গুছিয়ে নেওয়া? ওরকম বুদ্ধির দরকার নেই। সৎ এবং সরল সে, শত খুঁজলেও তার মত ভাল ছেলে পাওয়া যাবে না। তার ভাগ্যই তার সহায়, তাকে রক্ষা করবে।"

"ঠিক আছে, তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক। দেখি, বুদ্ধি-চালাকি বড় নাকি ভাগ্য বড়,"

শেখরের মনে ঈর্ষা জাগে। ঈর্ষার ফলে কুবুদ্ধি জাগে। রামকে সফল হতে কিছুতেই দেবে না। দেখা যাক সততা ও ভালমানুষীর মূল্য কতটা পায়। সে চলে যায় অন্যত্র। একজনের সঙ্গে গোপনে দেখা করে নানা কথাবার্তা বলে ফিরে আসে। পরের দিনই রাম ও সে শহরের পথে রওনা দেবে পছন্দমত জিনিস কেনার জন্য।

দুজনায় রওনা হয় শহরের দিকে। যাবার পথে পড়ে মস্ত এক জঙ্গল। গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে। কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ থেমে শেখর বলে রামকে, "কিছুদিন আগে আমি এই জঙ্গলের একটা গাছের কোটরে হাজার টাকা লুকিয়ে রেখেছিলাম। এখন নিয়ে গেলে ভাল হয়। আমি চাই না দ্বিতীয় কেউ জায়গাটা দেখুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি টাকাটা নিয়ে এখনই ফিরে আসব।"

সততা বড়। বুঝতে পারবে, সে কতখানি অসহায়।" শেখর জবাব দেয়।

লক্ষ্মীও সম্মত হয়। পরের দিন রাম এলে লক্ষ্মী তাকে অপেক্ষা করতে বলে শেখরকে এবং ইন্দুকে ডেকে পাঠায়। তারা এসে উপস্থিত হলে লক্ষ্মী সকলের সামনে শেখর এবং রামকে একশ করে টাকা দিয়ে বলে, তারা যেন নিজেদের ইচ্ছামত এমন কোন জিনিস নিয়ে আসে যা তার ও ইন্দুর পছন্দ হবে। তারপর চুপিসারে রামকে পৃথকভাবে বলে, "একটা কথা সর্বদা মনে রাখবে, যেখানেই থাক, যে অবস্থায়ই হোক তুমি তোমার স্বভাব হতে বিচ্যুত হবে না, তোমার সততা ত্যাগ করবে না। এতেই তোমার সাফল্য আসবে, কোন ক্ষতি হবে না।"

জঙ্গলের ভিতরে গাছের কোটরে শেখর একহাজার টাকা রেখেছে শুনে রাম অবাক হলেও কিছু প্রকাশ করে না। তাকে মৌন দেখে শেখর পুনরায় বলে, "জঙ্গলে অনেক ডাকু-ছিনতাইবাজ আছে। তারা বুদ্ধিমান ও চালাক লোকেদের থেকে সর্বদাই দূরে থাকে। তোমায় একলা ছেড়ে যাচ্ছি বলে আমার ভাবনা হচ্ছে। ভালর জন্যই বলছি, টাকাপয়সা সাবধানে রেখ, তুমিও সাবধানে থেক। আচ্ছা এক কাজ কর, লক্ষ্মী যে একশ টাকা দিয়েছে, সেটা আমাকে দিয়ে দাও। অন্তত তার টাকাটা নিরাপদে থাকবে।" বলে রামের কাছ থেকে একশ টাকা নিয়ে সে গাছের আড়ালে আড়ালে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

আগের দিন যে লোকটিকে তার কুমতলবের কথা জানিয়ে শেখর বলেছিল, সেও তাদের পিছন নিয়ে জঙ্গলে আসে। রাম এসবের কিছুই জানে না। শেখর রামের কাছ থেকে আলাদা হয়ে আড়ালে গেলে সেও একটু অপেক্ষা করে রামকে এসে আক্রমণ করে হাতে ছুরি নিয়ে। রাম অতর্কিত আক্রমণে ভীত হয়ে পড়ে। শেখরের বলামত রামকে ধমক দিয়ে ভয় দেখিয়ে যা ছিল সমস্ত কেড়ে নিয়ে দেয় চম্পট। রামের কাছ থেকে সোজা এসে হাজির হয় গাছের আড়ালে শেখরের কাছে। শেখরের হাতে তুলে দেয় সে যা পেয়েছে। কিছু পরে শেখর ফিরে আসে, মুখে এমন ভাব যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু শেখর আসতেই রাম নিজেই সবিস্তারে তাকে জানিয়ে বলল, "তুমি যেরকম বলেছিলে ঠিক সেরকমই ঘটল। তোমার জন্যই লক্ষ্মীর টাকাটা বেঁচে গেল যা তুমি চেয়ে নিয়েছিলে। তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না।"

শহরে পৌঁছয় দুজনে। এক গহনার দোকানের সামনে এসে রামকে দাঁড় করিয়ে শেখর দোকানের ভিতর ঢোকে। কিছু পরে ফিরে এসে রামকেও নিয়ে যায় ভিতরে। অনেক গহনার থেকে পছন্দ করে একটা গহনা নিয়ে দোকানের মালিককে একশ টাকা দেয় মূল্যস্বরূপ। মালিক একশ টাকা নিয়ে হাসিমুখে নমস্কার জানায় শেখরকে। তা দেখে রামও একশ টাকায় একটা গহনা কিনতে চাইলে দোকানের মালিক হেসে
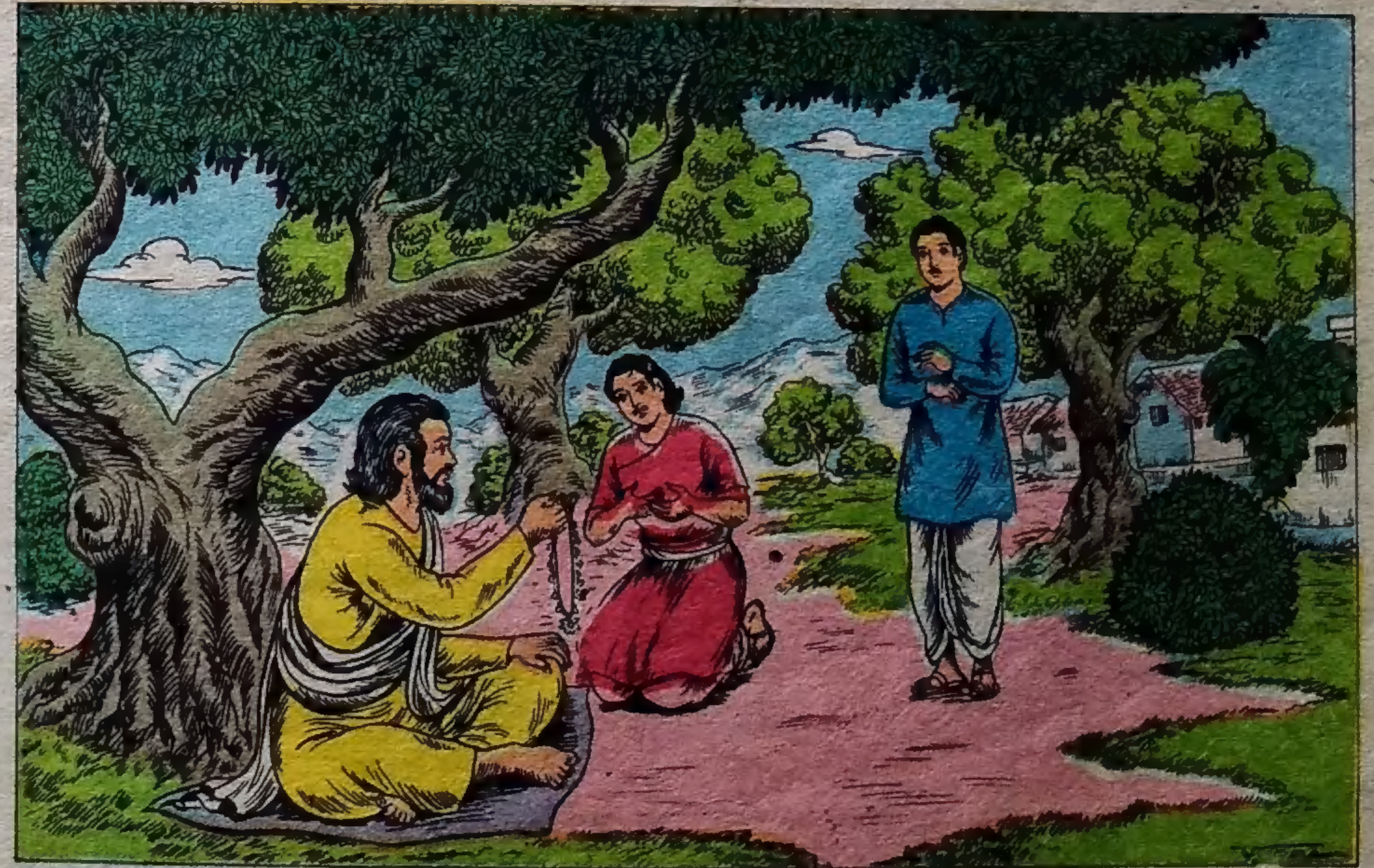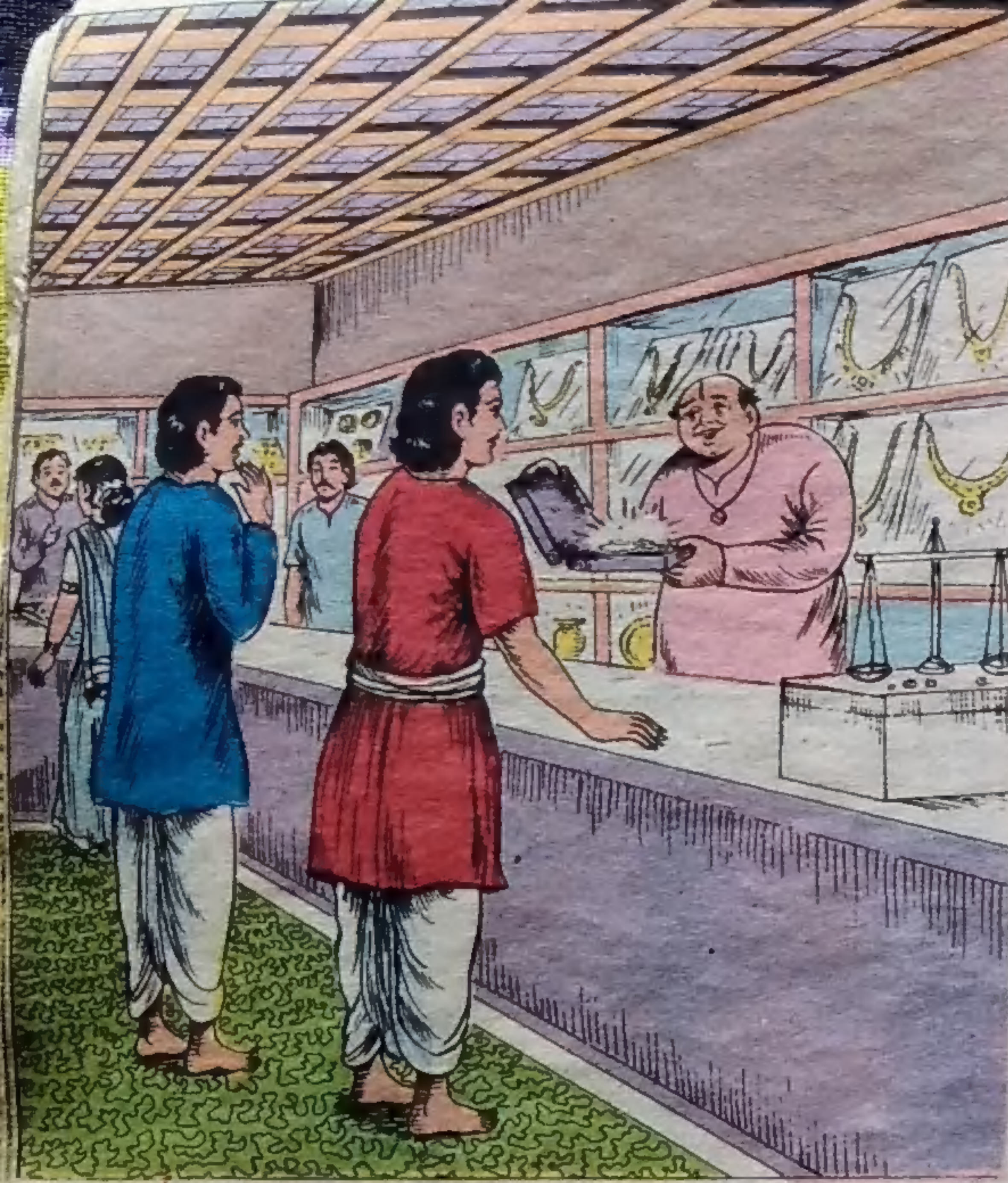
বলে, "শেখরবাবু তার মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমায় কত সাহায্য করে সময়ে-অসময়ে। তাকে কিছু দিতে পারলে আমিই ধন্য হয়ে যেতাম। কিন্তু তিনি তো তা নেবেন না। তাই এ টাকাটা নিতে আমি বাধ্য হলাম। ওটার আসল দাম অন্য কারোকে বিক্রি করলে দেড় হাজার টাকার কম নয়।"

এত দামী জিনিসের পাশে অন্য কোন জিনিসই মানাবে না। রাম স্থির করে, সে কিছুই কিনবে না। কোন বাক্যব্যয় না করে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। শেখর মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে রামের সঙ্গ নেয়। —আসলে, পূর্বেই যখন একা শেখর দোকানে ঢুকেছিল রামকে বাইরে রেখে তখনই সে দোকানের মালিকের হাতে টাকা দিয়ে ওরকম একটা ব্যবস্থা করে রেখেছিল। রাম সহজমনে ওরকম কিছু ভাবতেও পারেনি।

"সত্যি তুমি বুদ্ধিমান এবং পরোপকারী। তোমার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। জীবনে তুমি সত্যি সুখে থাকতে পারবে।" বলে রাম শেখরের সঙ্গে চলতে থাকে গ্রামের অভিমুখে।

শেখর সে-সময়ে রামকে বলে, "তুমি তোমার সমস্ত টাকা পয়সা হারিয়ে বসলে! ভাবতেও লজ্জা হচ্ছে। কি যে তোমার বুদ্ধি, শুধু শরীরটা আর মাথাটাই আছে। একটু বাধা দিতে পারলে না? কি যে হবে তোমার ভেবেই কূল পাই না। একবার ভাব তো, যদি তুমি লক্ষ্মীকে বিয়ে কর, তাহলে লক্ষ্মীর কি দুর্গতি হবে। বরং তুমি তাকে বোঝাও, সে যদি একান্তই মনে কিছু না করে তাকে আমি বিয়ে করতে রাজী আছি।"

জঙ্গল পার হয়ে গ্রামের সীমানায় পৌঁছে দেখে সেখানে ফকিরবেশী একজন অচেনা লোক বসে। রাম তার কাছে এসে হতাশ হয়ে জানাল সব কথা। সেও শুনতে চাইল। শোনার পর লোকটি বলে, "অসহায়দের সাহায্য করার জন্য দেবতা আমায় বলেছেন। সত্যি তুমি অসহায়। তুমি এই হারটা গ্রহণ কর। যাকে তোমার পছন্দ তাকে তুমি দিও। মনে রেখ, তোমার সততাকে তুমি বর্জন করবে না কোনমতেই। দেবতার সহায়তা সর্বদাই পাবে।"

রামের হাতে মোতির হার, তার সামনে শেখরের হারটি একেবারে ম্লান। তবুও শেখর চেঁচায়, "আস্ত বোকা রামটা। নেহাত ভাগ্যের জোরে এটা পেয়েছে।"

"ভালমানুষরাই ভাগ্যের সহায়তা পায়। ঠিক আছে, বিশ্বাস না হলে আবার দুজনে পরীক্ষা কর।" লক্ষ্মী জানায় তাদের।

পরদিন পুনরায় একশ টাকা করে নিয়ে তারা যাত্রা করে শহরের দিকে। এবারে যা ঘটল তা আগেরদিনের বিপরীত। সত্যি ডাকু এসে ধরল। শেখরের কাছ থেকে কেড়ে নিল সব। তার চালাকির জন্যই গেল সব। রামকে কিছুই করল না। শহরে এসে দোকানে ঢুকল। এবার রামও ঢুকে পড়েছে একসঙ্গে। দেখে দোকানের মালিক এগিয়ে এসে বলে, "আপনাকে অতি পরিচিত মনে হচ্ছে। আপনার সেবা করতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হবে। কি নেবেন বলুন।" রাম হেসে একটা ছোট্ট গহনা একশ টাকার বিনিময়ে নিল। শেখর রামের অলক্ষ্যে মালিকের সঙ্গে ব্যবস্থা করতে গেলে তাতে সে অসম্মত হয়। অগত্যা কোন গহনা ক্রয় না করেই তাকে ফিরতে হয়। জঙ্গলের শেষ সীমায় দেখে সেই ফকিরকে। বলে তাকে শেখর তার ঘটনা।

অচেনা লোকটি বলে, "তোমার মত অভাগা আর নেই। অথৈ জলে তোমাকে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করতে গেলে আমিই ডুবব। হতভাগারা নিজেদের দোষত্রুটি দেখতে পায় না, দেখলেও স্বীকার না করে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মনে করে সে যা করছে সেটাই সত্য। রাম ভাগ্যবান। তার সহজ সরল স্বভাব এবং সততাই তাকে রক্ষা করবে, সৌভাগ্য এনে দেবে। চালাকিতে হঠাৎ কোন কার্য করা যায়, কিন্তু কোন স্থায়ী ভাল কাজ হয় না। নিজেই বুঝলে। বন্ধুর প্রতিও যদি এরকম অসৎ ঈর্ষাভাব রাখ, তবে অন্যসকলের প্রতি তোমার মনোভাব কি হবে। নিজেকে শোধন কর, শিক্ষা দাও মনকে চরিত্রকে। দেখবে তুমিও সৌভাগ্যবান হয়ে উঠবে।"

ফিরে আসে লক্ষ্মীর কাছে। শেখর স্বীকার করে তার ত্রুটি।
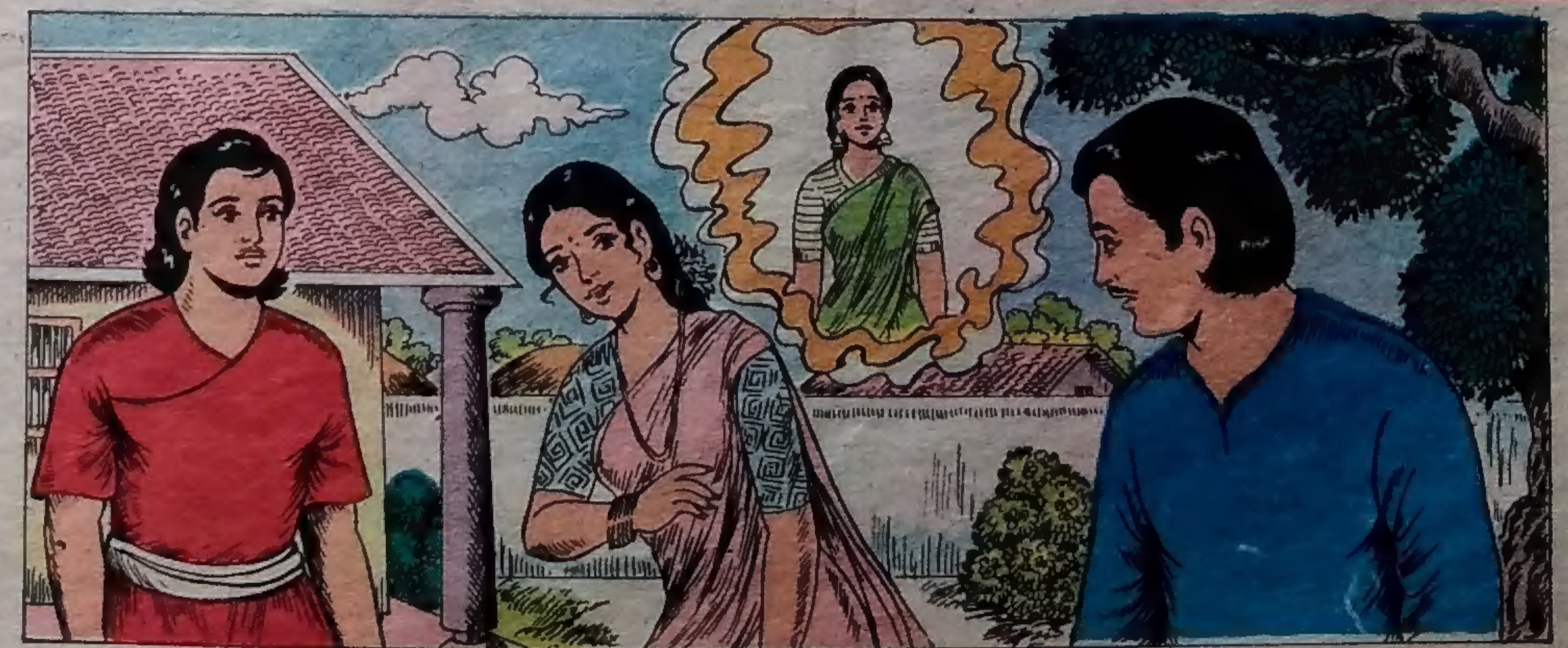
অতি সুন্দর, মিষ্ট

চন্দ্রকান্ত চাকরীর খোঁজে রাজস্থান গেলে সেখানে একজনের সঙ্গে আলাপ হয়, যে দরবারের বিষয়ে অনেক খবরাখবর রাখে। লোকটি চন্দ্রকান্তকে পরামর্শ দেয়, "জিহ্বেন্দ্রনাথ নামে একজন রাজকর্মচারী আছে যে তোমাকে মনে করলে চাকুরী দিতে পারে। শুনেছি সে পাখী খুব ভালবাসে। দেখ একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে।"

চন্দ্রকান্ত খোঁজ নিয়ে জানতে পারে এক মাস পরেই জিহ্বেন্দ্রনাথের জন্মদিন। ওইদিনই সে দেখা করতে যাবে, সঙ্গে নিয়ে যাবে একটা ভাল পাখী। একটা সুন্দর কথাবলা টিয়াপাখী কিনে বহু পরিশ্রম করে আরো কথা শেখায়। নির্দিষ্ট দিনে নিয়ে যায় রাজকর্মচারীর বাড়ীতে।

"আপনার জন্মদিনে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা," টিয়াপাখীটি বলে।

জিহ্বেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে পাখীটাকে দেখে কেবল বলে, "ধন্যবাদ"।

টিয়াপাখীটাও জবাব দেয়, "ধন্যবাদ"। চন্দ্রকান্ত তার চাকুরীর কথা নিবেদন করে। রাজকর্মচারী কয়েকদিন পরে দেখা করতে বলে তাকে।

এক সপ্তাহ পরে চন্দ্রকান্ত এলে তাকে জিহ্বেন্দ্রনাথ বলে, "খুব ভাল। সোমবার থেকেই কাজে লেগে যাও। আর কিছু বলবে?" চন্দ্রকান্ত তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করল, "ওই পাখীটা আপনার কেমন লাগল?"

"খুব ভাল। পাখীদের মাংসের মধ্যে টিয়ার মাংস আমার খুব ভাল লাগে। সেদিনই তোমার দেওয়া পাখীটার মাংস খেলাম। বেশ তৃপ্তি পেয়েছি। অতি সুন্দর, মিষ্ট।" জিহ্বেন্দ্রনাথ জানাল।
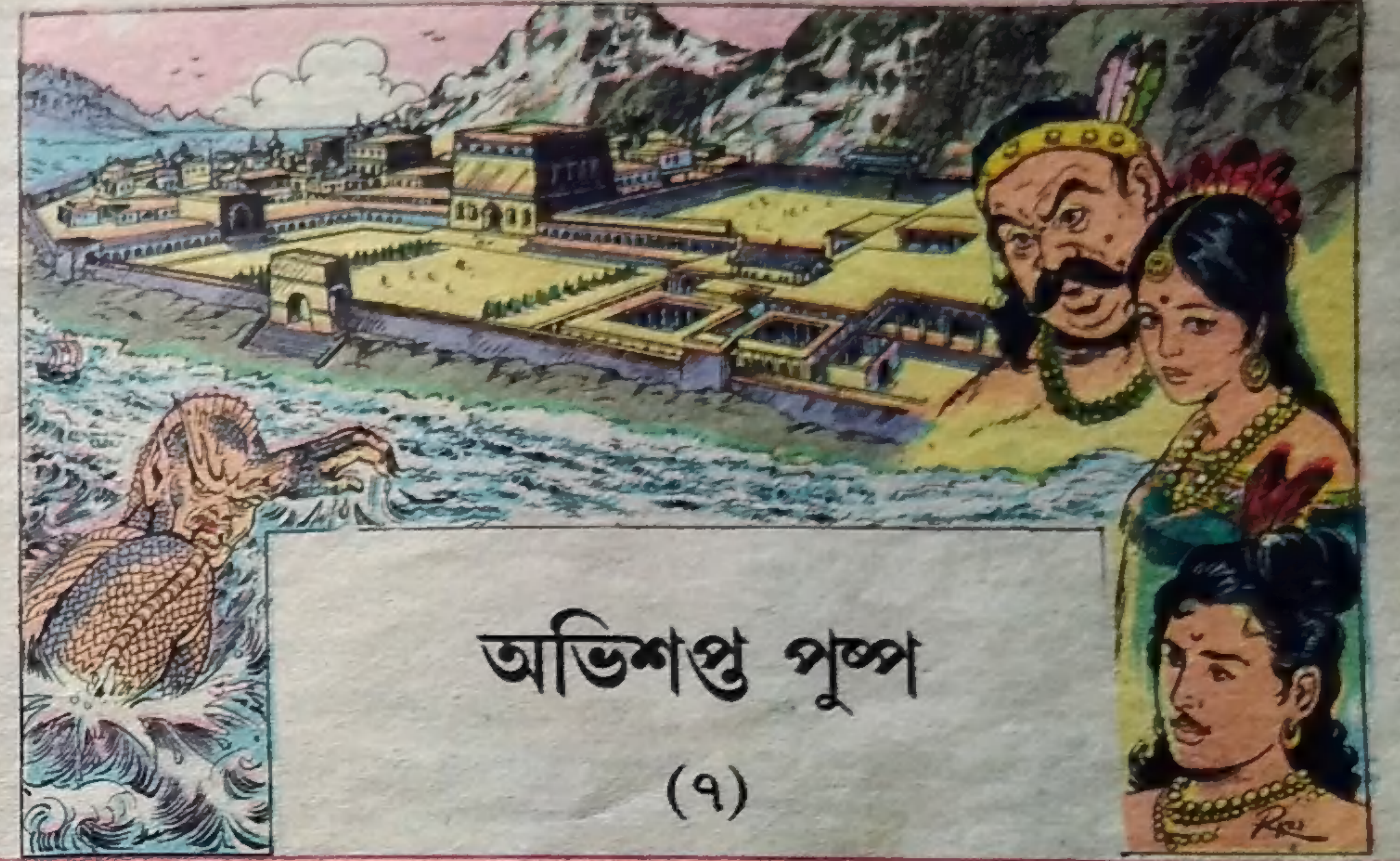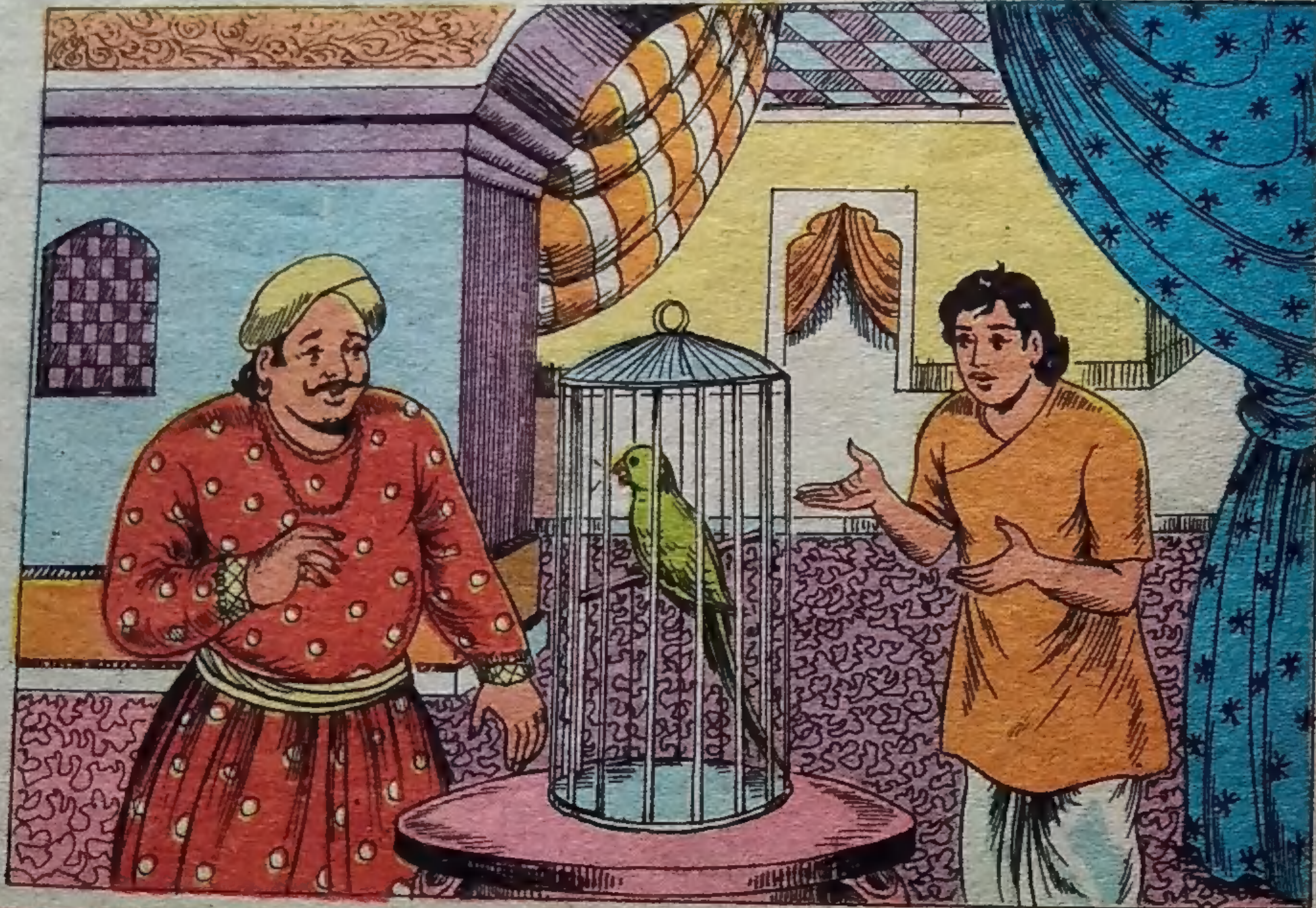
অভিশপ্ত পুষ্প

(৭)

[কুসুমপুর রাজ্যে উত্তরের পার্বত্যাঞ্চলে প্রস্ফুটিত 'শতাব্দিকা' পুষ্পের সুগন্ধের আকর্ষণে রাতের অন্ধকারে সমুদ্রগর্ভ হতে উঠে আসে দানব—শতবর্ষ পূর্বের অভিশাপগ্রস্ত রাজপুত্র চন্দ্রমণি। দানবের অভিযানের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রোপকূলবর্তী জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দানবকে ভিন্নমুখী করার প্রচেষ্টায় থাঙ্গল 'শতাব্দিকা' পুষ্পের গুচ্ছ নিয়ে চলেছে সমুদ্রাভিযানে—উপকূল হতে দূরে...]

সমুদ্রের উত্তাল জলরাশির মধ্যে থাঙ্গলের নৌকা ঢেউয়ের দোলায় চলেছে। সমুদ্রে নৌকা-চালনায় অনভিজ্ঞ থাঙ্গল শক্তহাতে হাল ধরে রয়েছে। তাদের পার্বত্য নদী চিত্রা জলে পরিপূর্ণ হয়ে যখন পাহাড়ী ঢাল ও খাদ পেরিয়ে দুর্দম বেগে ছুটত, সেসময়ে কাঠের ভেলা তৈরী করে বন্ধুদের নিয়ে থাঙ্গল সেখানে জলক্রীড়া করত। জলস্রোতের ধারায় জলপ্রপাত পেরিয়ে আসা তাদের কাছে ছিল দুঃসাহসিক অভিযানসম। এরজন্যই সে এগিয়ে এসেছে সমুদ্রের উপরে এই দুরভিযানে। দুঃসাহসিক এরকম অভিযান তাকে যেন সর্বদা হাতছানি দিয়ে ডাকে, তার রক্তে রয়েছে তাদের প্রতি দুর্বার এক আকর্ষণ।

থাঙ্গলের ধারণা ছিল, হয়তো তাকে খুব বেশি দূর যেতে হবে না; সামান্য যাওয়ার পরই পেয়ে যাবে কোন দ্বীপ বা স্থলভাগ, যেখানে পার্বত্যাঞ্চল হতে আনা শতাব্দিকা পুষ্পগুচ্ছ এবং চারাগুলো রেখে আসতে
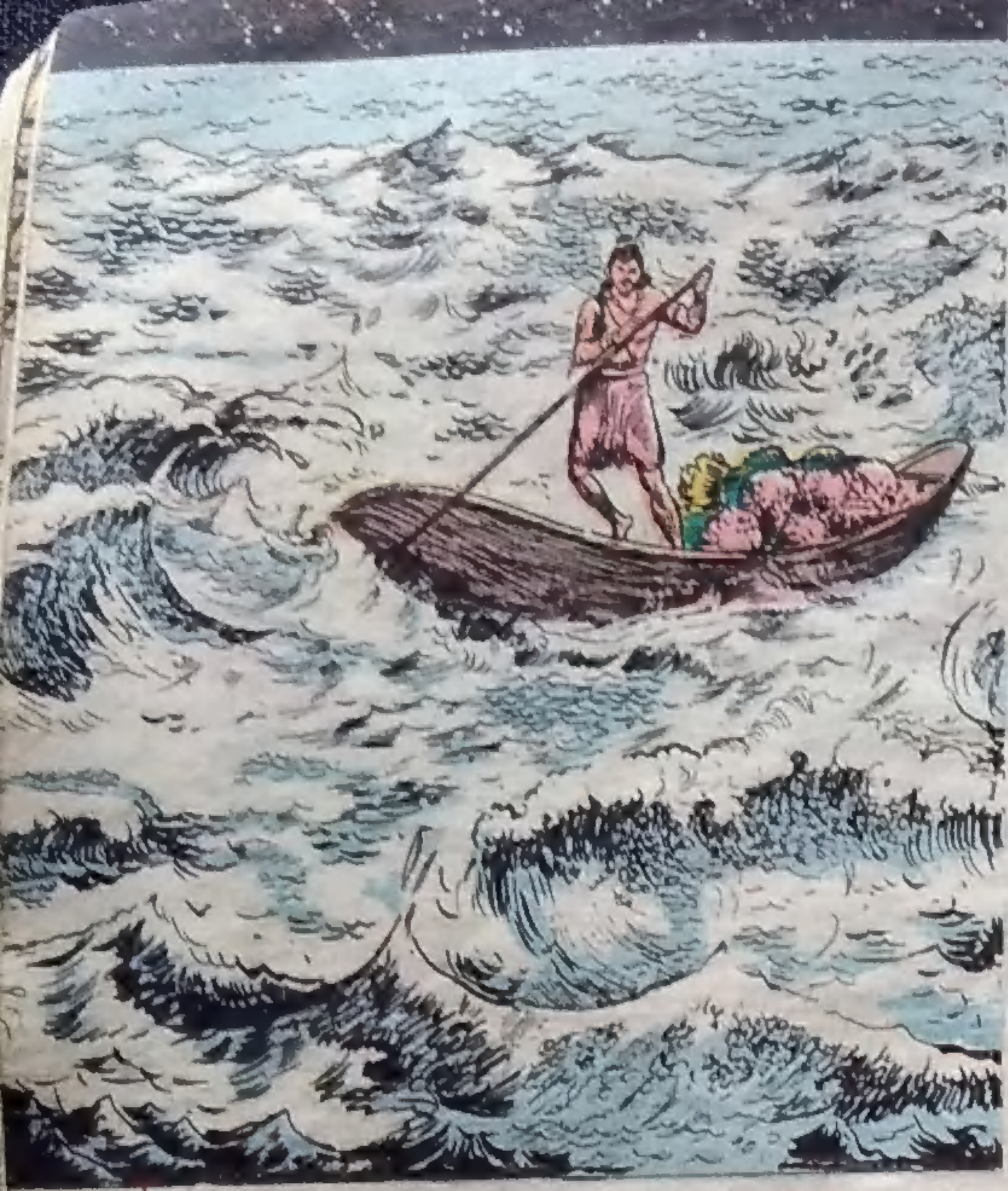
পারবে। দানবটা নিশ্চয়ই ফুলের আকর্ষণে সেখানে যাবে, কুসুমপুর রাজ্য দীর্ঘদিনের জন্য দানবের অভিযান হতে রক্ষা পাবে। পর্বতের উপরে সামান্য চারাগাছ অবশিষ্ট রেখে থাঙ্গলের সাথীরা সমস্ত নিয়ে এসেছে। যে কয়েকটি চারাগাছ আছে, তা থেকে ফুল হতে বহু বৎসর সময় নেবে। সুতরাং দানবের আক্রমণ হতে মুক্ত তারা।

শক্তহাতে হাল ধরে নৌকা ঠিক রাখতে হিমসিম খাচ্ছে থাঙ্গল। ঢেউয়ের তালে নৌকা উঠছে নামছে। অনেক দূর সমুদ্র পেরিয়ে এসেছে নৌকা। এতদূর নৌকা আনতে তাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। উপকূল হতে যতদূরে আসে ততই সমুদ্র শান্ত। থাঙ্গল এবার হাল ছেড়ে দাঁড় নিয়ে বসে; এ-হাতে ও-হাতে দাঁড় টেনে চলে।

কঠিন পরিশ্রমের ফলে সে বুঝতেই পারেনি যে, দিন ফুরিয়ে গেছে, সূর্য ডুব দিয়েছে দিগন্তের তলে, আলো নিভে আসছে ক্রমে। এখনও পর্যন্ত দানবটার কোন নামগন্ধ নেই। দানবটা সম্বন্ধে রাজা প্রতাপবর্মার বর্ণনা তার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে; তাই সমুদ্রের কোথাও যদি দানবের অভ্যুত্থান ঘটে, তার দৃষ্টি এড়াবে না।

চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। মেঘমুক্ত আকাশে ক্রমে ফুটে উঠে নক্ষত্রের আলোরাশি। থাঙ্গল সজাগ সতর্ক। দানবের আসার এই সময়, নিশ্চয়ই ফুলের ঘ্রাণ পেয়েছে ওটা। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে থাঙ্গল। আকাশের গায়ে নক্ষত্রদের মিটিমিটি আলোয় সৃষ্টি হয়েছে যেন একটি চাঁদোয়া, কিন্তু সমুদ্রগর্ভ হতে কোন বিরাটকায় কিছু উঠে এলে তাকে বোঝার জন্য এই আলো যথেষ্ট। নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখছে থাঙ্গল। দূরে, বহুদূরে, তার পিছনে একটা যেন ঘন কালো বিরাটকার কিছু! সজাগ দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করে, বিরাট কোন মাছ বাতাস নেবার জন্য জলের উপরে ভেসে উঠেছে কিনা। যদি তাই হয়, জলের ভিতরে ডুব দেবে পরমুহূর্তে। কিন্তু না, বস্তুটি ক্রমশই জলের উপরিভাগে উঠে আসছে, আকৃতিটাও বড় হচ্ছে। নৌকার দিকেই এগিয়ে আসছে। থাঙ্গল নৌকা ঘুরিয়ে বিপরীতদিকে যতটা সম্ভব দ্রুত চালাবার চেষ্টা করে। বোঝবার চেষ্টা করে ওটার সঙ্গে তার ফারাক কতটা। বোধ হল, যেন দানবমূর্তিটার গতি একটু শ্লথ, কিন্তু অনেকটাই দেখা যাচ্ছে।

থাঙ্গল নিশ্চিত, এই সেই দানব। কুৎসিত মাথাটি, কাঁধ, বাহুদ্বয় আঁধারের মধ্যে হলেও ভালই বোঝা যাচ্ছে। কল্পনা করে, দানবের লম্বা পাদুটি হয়তো অগভীর সমুদ্রতল স্পর্শ করে আছে। বিরাট ওজনের ফলে সাঁতার কাটা দানবটির পক্ষে সম্ভব নয়, মন্থর গতিতে সেটাকে হেঁটেই আসতে হবে।

যতক্ষণ-না কোন ডাঙার নিশানা পায় ততক্ষণ থাঙ্গলকে এক নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতেই হবে। বার বার পিছন ফিরে দেখে দানবটাকে। ঠিক অনুসরণ করছে তাকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাঁড় টানে। একটুও ক্লান্তি নেই তার। অভিযানকে সফল করতেই সে ব্যস্ত। সহসাই দূরে দেখা যায় পাহাড়ের সারি। ডাঙা অবশেষে! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে। কিন্তু এই পাহাড়ি ডাঙার শেষ কোথায়, কোথায় শুরু? লক্ষ তারার মিটিমিটি আলোতে পাহাড়ের উচ্চতা ও ঢালগুলো বোঝার চেষ্টা করে। যতই সে এগিয়ে চলে ততই তার নৌকার নাচন বাড়ে। উপকূলে আছাড় খেয়ে ফিরতি ঢেউয়ের ধাক্কা লাগে নৌকার গায়। থাঙ্গল হাল হাতে নিয়ে দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করে নৌকাকে সামাল দিতে। কিন্তু হায়, ঢেউয়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় নৌকা আছড়ে গিয়ে উল্টো হয়ে পড়ে উঁচু শিলারাশি পার হয়ে বিপরীতদিকের বালুর উপর। থাঙ্গলও ছিটকে গিয়ে পড়ে আরেকটু দূরে বালুর উপরে 'শতাব্দিকা' ফুলগুচ্ছসহ।

থাঙ্গল উঠে দাঁড়িয়ে দেখে নেয় চারিদিক। তীরের গতিতে নৌকার কাছে ছুটে গিয়ে সেটাকে টেনে ধরে। বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ফুলগুলো। কিছু ফুল সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে চলে যায়। দানবটি নিশ্চয় এখানে আসবে। সে কি তাহলে পুনরায় নৌকাতে যাত্রা করে খাঁড়ির ভিতর দিয়ে দানবটাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে প্রস্তরময় ভূমিখণ্ডের শেষপ্রান্তে? কিন্তু খাঁড়ি এত সঙ্কীর্ণ যে বিশালাকার দানবটির প্রবেশ সেস্থানে অসম্ভব। আর শিলাময় পাহাড়টাকে ভূমিসাৎ করে আসাও অসম্ভব। কিন্তু দানবটা যদি খাঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে তার যাবার পথটাই বন্ধ করে দেয়?

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাঙ্গল, যদি দানবটাকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এল না। কেন এল না, কিছু পরেই সে বুঝতে পারল। পূর্ব দিগন্তে তখন আলোর রেখা ফুটে উঠছে। তার অর্থ দানবটা দিনের
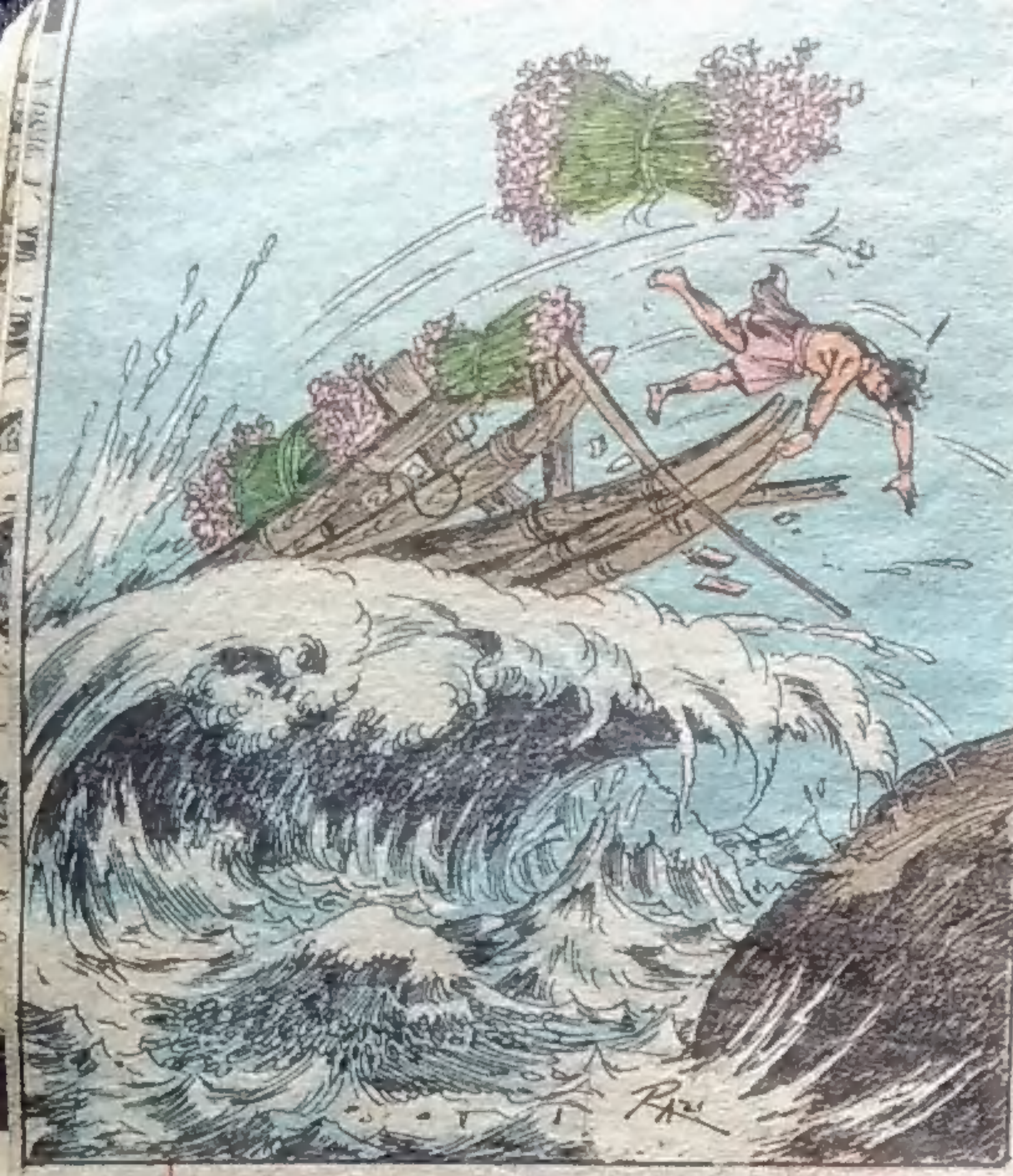
আলো থেকে পালিয়েছে, পুনরায় রাতের অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত ওটা আর আসবে না ফুলের জন্য।

এবারে থাঙ্গল একটু বিশ্রাম নেবে। তারপরে সে জায়গাটা একটু ঘুরে দেখে স্থির করবে কোথায় ফুলের বোঝাগুলো রাখবে। তাহলে নিজের দেশে তার তাড়াতাড়িই ফেরা সম্ভব হবে। প্রথমে নৌকার কাছে এসে সেটাকে সোজা করে ঠিকঠাক করে নিল। তারপর ছড়িয়ে থাকা ফুলগুলোকে নৌকাটার ভিতরে রাখে। সেগুলি যেমন সতেজ তেমনই চারিদিকে এর গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

বালির উপরে শুয়ে পড়ে থাঙ্গল। তার মনে ছবি ফুটে ওঠে একের পর এক: রাজকন্যা প্রিয়ম্বদাকে 'শতাব্দিকা' ফুলের একটি গুচ্ছ উপহার দেওয়া, তাদের অঞ্চলে রাজা ও রাজকন্যার আগমন, তার প্রতি সর্দার খাম্বার স্নেহ ও শ্রদ্ধা এবং তার বোন লাইসেনার খাবারের ছোট্ট পুঁটুলি। বোনের কাছ থেকে সে এখন অনেক দূরে, একথা ভেবে তার দুঃখ হয় মনে। নিজেকে সান্ত্বনা দেয় ভেবে, ছোটবোনটি হয়তো সেসময়ে রয়েছে রাজকুমারীর সঙ্গে প্রাসাদে। রাজকুমারী বেশ সহৃদয়া এবং দয়ালু।

সহসা ঘুম ভেঙে যায় থাঙ্গলের। কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, কতক্ষণ ঘুমিয়েছে বা কি তাকে জাগিয়ে তুলল, সে কিছুই জানে না। মনে হচ্ছে, যেন হাসির শব্দ সে শুনেছে। তাহলে কি স্বপ্ন দেখছিল? এই দিনের আলোয়? তারপরই তার বিস্ময় জাগে যখন ছয়টি গ্রাম্য যুবতী এগিয়ে এসে ঘিরে ধরে তাকে। তাদের দেহে নানা ফুল শোভা পাচ্ছে, এমনকি চুলেও ফুল লাগান। রঙবেরঙের পোশাক তাদের গায়ে। তারাও কোন উপজাতি সম্প্রদায়ের, তাদের ভাষার একবর্ণও তার বোধগম্য হল না। তাদের দীর্ঘ বাক্যালাপে মাত্র কয়েকটি শব্দ তার জানা। আরো আশ্চর্য হল, প্রত্যেকটি যুবতীই একগুচ্ছ করে 'শতাব্দিকা' হাতে ধরে আছে, এবং মাঝে মাঝেই তার আঘ্রাণ নিচ্ছে। ভাবতে থাকে থাঙ্গল, ওরা কি ওকে একা থাকতে দিয়ে ফুলগুলো যথাস্থানে রেখে ফিরে যাবে, না কি অন্য কিছু। নীরব হয়ে বোঝার চেষ্টা করে, ওরা কি বলছে।

"আমি এই ফুলগুলোকে কুসুমপুর থেকে নিয়ে এসেছি, বহু দূর দেশে নিয়ে যাচ্ছি। দয়া করে ফুলগুলো নৌকার মধ্যে
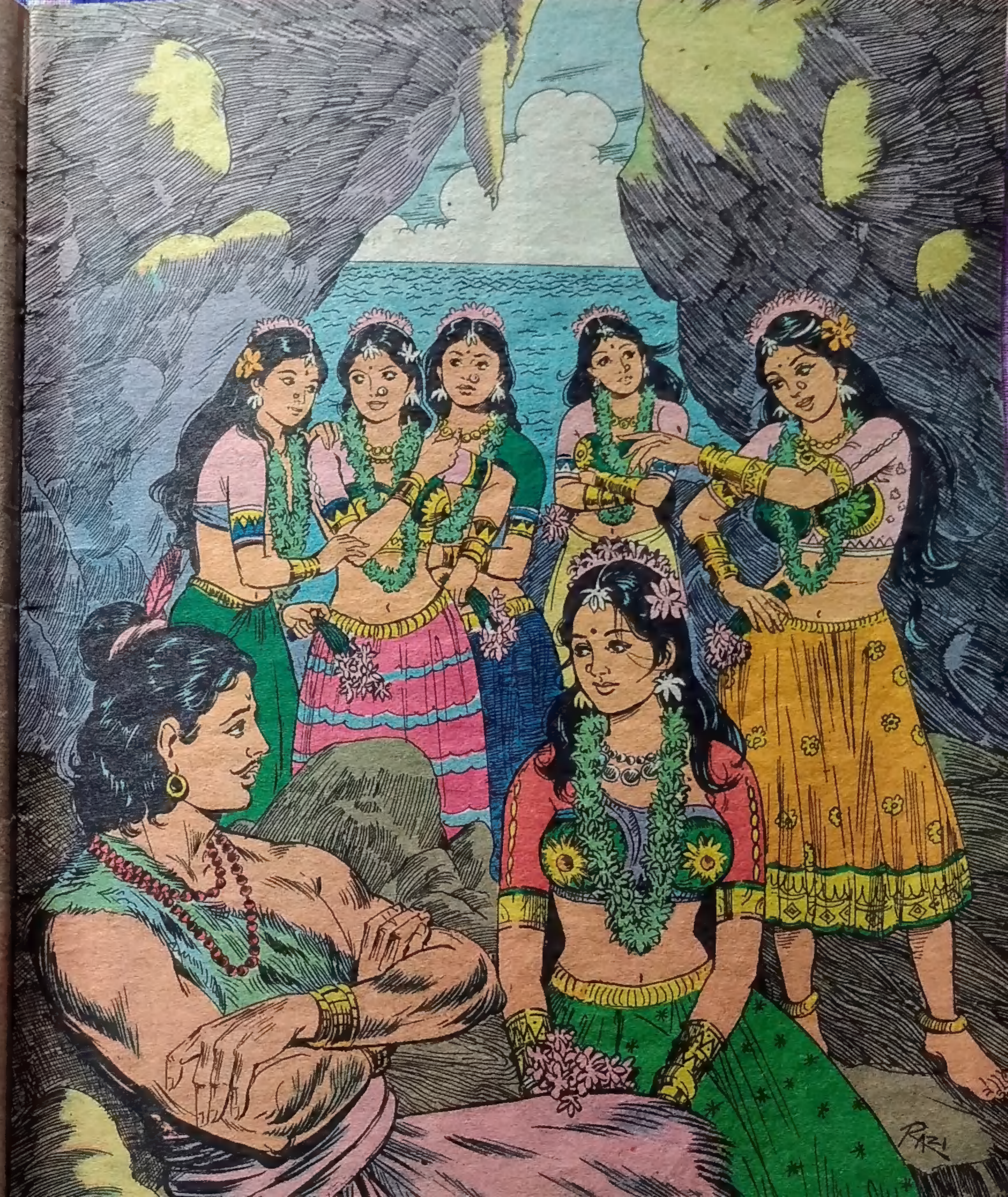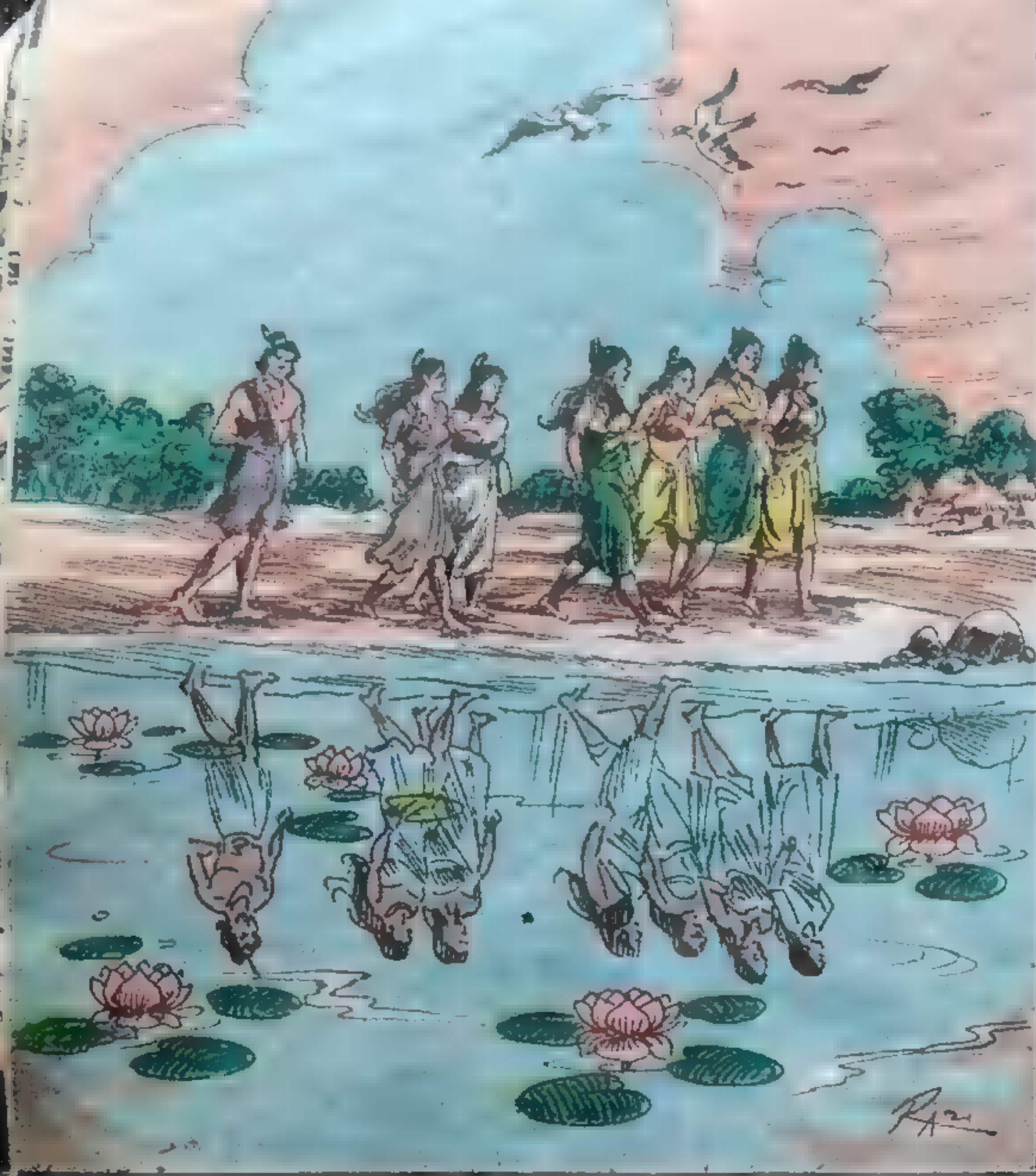
রেখে দিন। অন্ধকার নামলেই আমি যাত্রা করব।" কথাগুলো ভেঙে ভেঙে বলে গেল থাঙ্গল এই আশায়, যদি তারা তার ভাষা বোঝে। দানবের কথা ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেল।

"কুসুমপুর! কুসুমপুর!" মনে হল নামটা তাদের শোনা। আর কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

বালি থেকে উঠে সে নৌকার কাছে গিয়ে বলল, "ফুলগুলো তোমরা এখান থেকে নিয়েছ?" তারা সম্মতি জানাল মাথা নেড়ে। "তোমরা ওগুলো ফিরিয়ে দেবে কি?" তার এই প্রশ্নের উত্তরে মেয়ের দল যেন বলল, "না, সুন্দর গন্ধ, সুন্দর ফুলগুলো!" "ওগুলো আমার, আমি এনেছি, অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে," রাগত সুরে বলল থাঙ্গল। মেয়েরা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠে ফুলগুলো বুকে চেপে ধরে গন্ধ নিতে থাকে।

তাদের বোঝাতে ব্যর্থ হল থাঙ্গল। কি করবে বুঝতে পারছে না। এরই মধ্যে একটি যুবতী এগিয়ে এসে থাঙ্গলের কাঁধ স্পর্শ করে বলে, "এই ফুলগুলো নিয়ে আমরা বাড়ী যাচ্ছি। তুমি কি আসবে আমাদের সাথে?" কথা শেষ করেই তারা চলতে শুরু করে। থাঙ্গল যেন এই কারণেই বুঝতে পারল তাদের কথা।

"যাব তোমাদের সাথে, কিন্তু আমার ফুল আমায় ফিরিয়ে দিতে হবে।" নৌকার ভিতরে তাকিয়ে দেখল, ফুলগুলো সব নিলেও চারাগাছগুলো নেয়নি। ওগুলোকে নৌকাতে ছেড়ে যাওয়া উচিত কিনা তাও বুঝতে পারছে না। ফিরে এসে নৌকাটাকে এই জায়গাতেই দেখতে পাবে, তারই-বা নিশ্চয়তা কি? জোয়ারের জলে নৌকাটা ভেসে যাবে না তো? আরেকটু টেনে আনে বালুর উপরের দিকে—যতটা পারল। দাঁড়দুটো নৌকার ভিতরে রাখল।

যুবতীরা ঘুরে দাঁড়িয়ে তার সব কাণ্ড দেখছে আর হাসছে। সংশয় না রেখে থাঙ্গল চারাগুলো হাতে নিয়ে তাদের পিছনে অনুসরণ করে চলা শুরু করে নীরবে। কিন্তু কানটাকে খাড়া রাখে, যুবতীদের বাক্যালাপ যদি বুঝতে পারে। কিন্তু কোন লাভ হল না। মাঝে মাঝেই যুবতীরা পিছন ফিরে দেখে, তাদের অনুসরণ করছে নাকি অন্যদিকে চলে যাচ্ছে।

উপকূলীয় বালুকারাশি পার হয়ে এল এক বন্ধুর ভূমিখণ্ডে। থাঙ্গলের মনে হয়,

অঞ্চলটি যেন অনুচ্চ পাহাড়বেষ্টিত একটি গামলার মত। পাথুরে অঞ্চল, বড় গাছ বা সেরকম কিছু নেই। মাঝে মাঝে সবুজের আস্তরণ। ছোট্ট একটা গ্রাম। দূরে দূরে কয়েকটি কুঁড়েঘর। কয়েকটি মহিলা বেরিয়ে এসে কৌতূহলী হয়ে যুবতীদের কি সব জিজ্ঞাসা করে তাদের ভাষায়। যুবতীরা দুই-একটা শব্দে উত্তর দিয়ে এগিয়ে যায়। অবশেষে এসে পৌঁছায় একটা বড় কুটিরে, অন্যগুলির মত হলেও বেশ শক্তসামর্থ্য।

প্রধান দরজার সিঁড়ির ধাপের কাছে গিয়ে যুবতীরা ডাক দেয়, "মায়ি! মায়ি!" মধ্যবয়স্কা উপজাতি এক মহিলা বেরিয়ে আসে। "দেখ আমরা কি এনেছি। ফুলগুলো সুন্দর না?" সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবতীটি এক গুচ্ছ ফুল তার হাতে তুলে দেয়।

"সত্যি সুন্দর! কোথায় পেলে এগুলোকে? আর এই-বা কে?" মহিলাটি জিজ্ঞাসা করে থাঙ্গলকে ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে।

"সমুদ্রতটে বালুরাশির উপরে তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলাম," যুবতীটি উত্তর দেয়। "সে একটা নৌকার কাছেই শুয়ে ছিল। নৌকার ভিতরে ফুলগুলো ছিল। আমরা ভাবলাম ও নিশ্চয়ই ফুলগুলো আমাদের জন্য এনেছে, তাই আমরা নিয়েছি। মনে হয়, সুদূর সেই কুসুমপুর থেকে এসেছে। আমাদের অনেক কিছুই বলল, কিন্তু আমরা একবর্ণও বুঝিনি। আমাদের সঙ্গে তাকে আসতে বললাম, এল আমাদের সঙ্গে। বেশ সুন্দর সুপুরুষ, তাই না?" লজ্জায় সে জিজ্ঞাসা করে।

"ঠিক বলেছিস!" মহিলাটি হেসে জবাব দেয়। "কাবুই ফিরে আসুক। সে-ই এর সঙ্গে কথা বলবে। তোরা সকলে ভিতরে যা।"

যুবতীর দল একে একে ভিতরে যায়। মহিলাটি থাঙ্গলকে ইশারায় বারান্দার উপরে বসতে বলে নিজেও ভিতরে গিয়ে ঢোকে।

থাঙ্গল তাদের কথোপকথনের এক-বিন্দুও বুঝতে পারল না, তবে তাকে যে কুসুমপুরের লোক বলে বুঝতে পেরেছে সেটা নিশ্চিত। গ্রামের যে অংশে কুটিরের অবস্থান এবং কুটিরের আয়তন দেখে তার ধারণা হল, সেটা নিশ্চয়ই সর্দারের বাসগৃহ। যতই দেরী হোক, অপেক্ষা করে থাকবে সে সর্দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। এর মধ্যে মহিলাটি পুনরায় ঘরের ভিতর হতে বেরিয়ে এসেছে; হাতে একটি পাত্র—

পানীয় ভর্তি। থাঙ্গলের সামনে রেখে বলল, "নিশ্চয়ই খুব পরিশ্রান্ত। এটা পান কর। তোমার সঙ্গে কি কোন খাবারদাবার আছে?"

থাঙ্গল মাথা নেড়ে ইশারায় জানায়, নেই। "নেই?" মহিলাটি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, "কাবুই এখনই এসে পড়বে। সে এলে তোমরা একসঙ্গে খেতে পার।"

এক নিঃশ্বাসে চুমুক দিয়ে ভরাপাত্র শূন্য করে থাঙ্গল। তারপর একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে! সে ভাবতে থাকে, যুবতীরা যে ফুলগুলো বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেছে সেগুলোর কি হবে। দানবটা কি এখানেও হানা দেবে? যতদূর দেখেছে সে, এখানে আসার ওই সঙ্কীর্ণ খাঁড়িপথ ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই। আর দানবটাও কি ওইপথ দিয়ে আসার চেষ্টা করবে! সে আরো লক্ষ্য করেছে, চারিদিক কেবল শক্ত পাথরে তৈরী পাহাড়শ্রেণী, কোন কোন শিখরের উচ্চতাও বেশ। সাগরের ঢেউয়ে যে ফুলগুলো ভেসে গেছে, সেগুলো এর মধ্যে অনেকদূর চলে গিয়ে থাকবে। আশা করা যায়, সেগুলো পেয়ে দানবটা সন্তুষ্ট থাকবে, ওতেই খুশি হবে। যদি কোন প্রয়োজন আসে, তবে এখানকার লোকেরা তাকে কি সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে? সে ভাবতে থাকে চোখ বন্ধ করে।

বলিষ্ঠ হাতের ঝাঁকুনিতে তন্দ্রা ভেঙে যায় থাঙ্গলের। সে তাকিয়ে দেখে। একজন তার সামনে দাঁড়িয়ে। সেই তার কাঁধ ধরে নেড়েছে। থাঙ্গলের ধারণা, নিশ্চয়ই এ সেখানকার উপজাতি সর্দার হবে।

"কে তুমি?" জিজ্ঞাসা করে।

থাঙ্গল ভাষা বুঝল না, কিন্তু আন্দাজ করে নিজের ভাষাতেই উত্তর দিল, "আমার নাম থাঙ্গল। কুসুমপুর রাজ্যের উত্তরে নাঙমাই পার্বত্য অঞ্চল হতে এসেছি।"

"নাঙমাই থেকে! ভিতরে এস!" বলে থাঙ্গলকে পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে যায়। থাঙ্গল বুঝল, এই সর্দার-লোকটি তাদের ভাষা এবং তাদের অঞ্চলের সম্বন্ধে জানে। স্বস্তি নেমে আসে থাঙ্গলের মধ্যে।

(ক্রমশ)
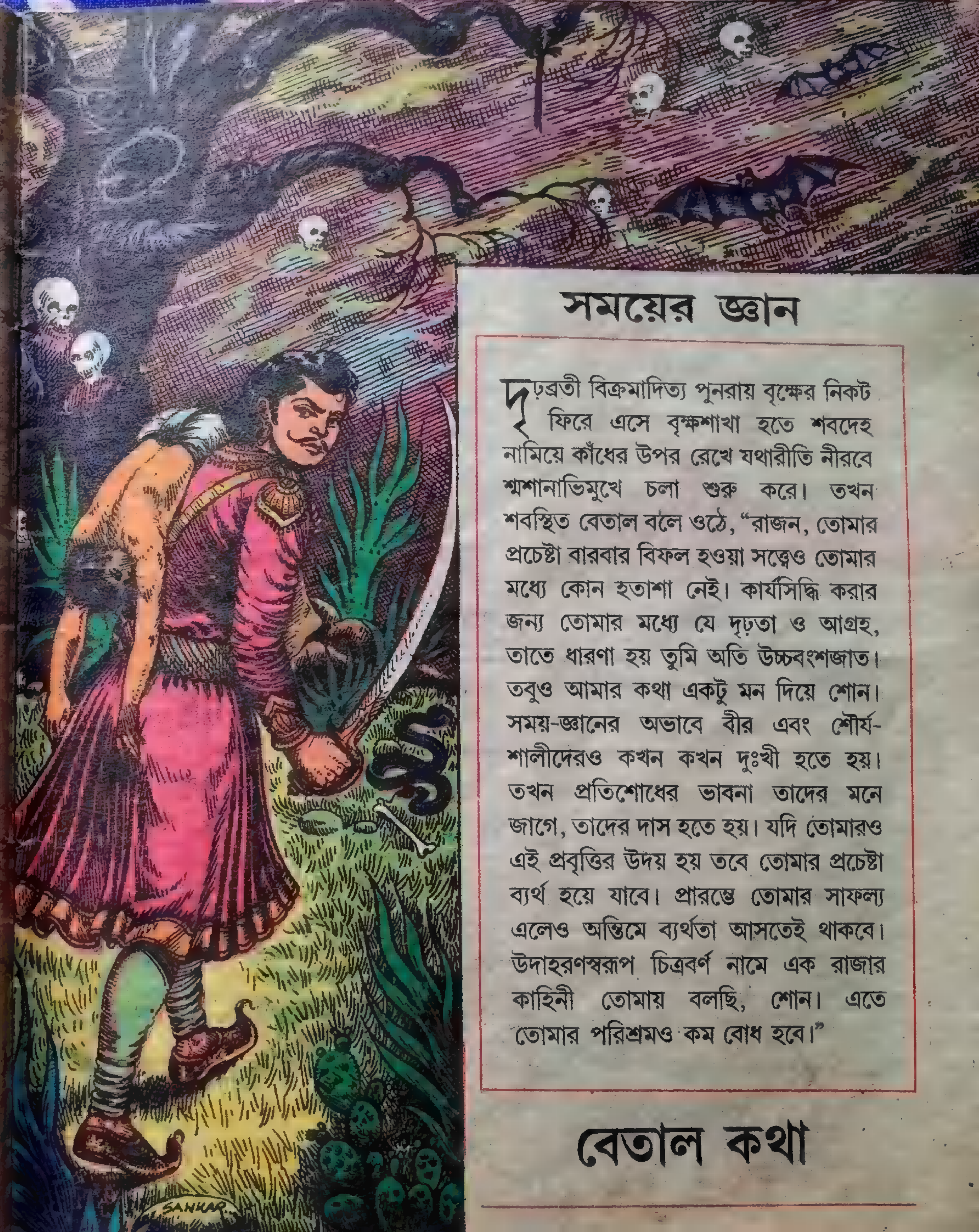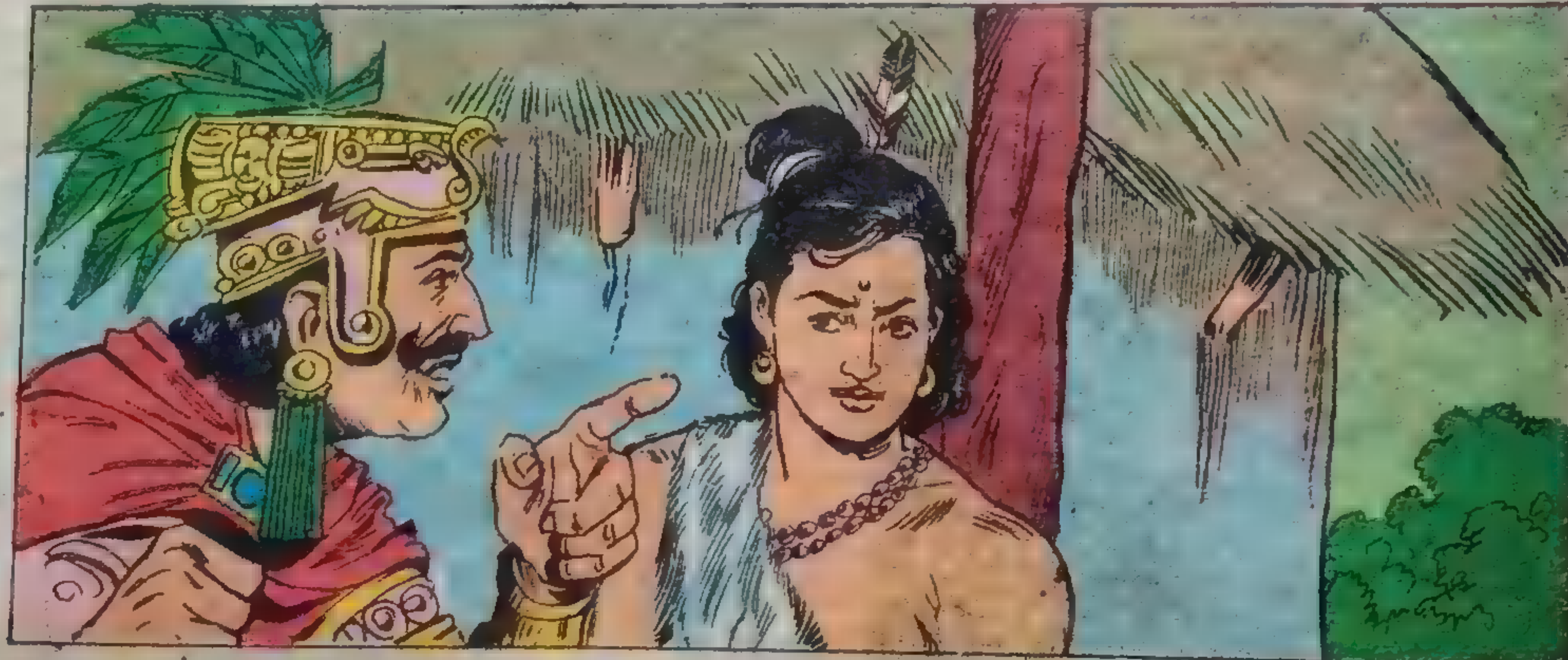
সময়ের জ্ঞান

দৃঢ়ব্রতী বিক্রমাদিত্য পুনরায় বৃক্ষের নিকট ফিরে এসে বৃক্ষশাখা হতে শবদেহ নামিয়ে কাঁধের উপর রেখে যথারীতি নীরবে শ্মশানাভিমুখে চলা শুরু করে। তখন শবস্থিত বেতাল বলে ওঠে, "রাজন, তোমার প্রচেষ্টা বারবার বিফল হওয়া সত্ত্বেও তোমার মধ্যে কোন হতাশা নেই। কার্যসিদ্ধি করার জন্য তোমার মধ্যে যে দৃঢ়তা ও আগ্রহ, তাতে ধারণা হয় তুমি অতি উচ্চবংশজাত। তবুও আমার কথা একটু মন দিয়ে শোন। সময়-জ্ঞানের অভাবে বীর এবং শৌর্য-শালীদেরও কখন কখন দুঃখী হতে হয়। তখন প্রতিশোধের ভাবনা তাদের মনে জাগে, তাদের দাস হতে হয়। যদি তোমারও এই প্রবৃত্তির উদয় হয় তবে তোমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। প্রারম্ভে তোমার সাফল্য এলেও অন্তিমে ব্যর্থতা আসতেই থাকবে। উদাহরণস্বরূপ চিত্রবর্ণ নামে এক রাজার কাহিনী তোমায় বলছি, শোন। এতে তোমার পরিশ্রমও কম বোধ হবে।"

বেতাল কথা

বেতাল তার কাহিনী শুরু করে:

বিচিত্ররাজ্যের রাজা চিত্রবর্ণ। পিতার মৃত্যুর পর রাজ-সিংহাসনে বসে। অল্প-সময়ের মধ্যে সমর্থ এবং যোগ্য শাসকরূপে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করে। পদ্মগিরির রাজকন্যা রাগিণী স্বয়ম্বর সভায় তাকেই পতিরূপে বরণ করে নেয় মাত্র একবৎসর পূর্বে। রাগিণী সুন্দরীই কেবল নয়, রাজনৈতিক বিষয়েও তার ভাল জ্ঞান ছিল। শাসন-সংক্রান্ত কোন সমস্যার উদ্ভব হলে সে তার স্বামী রাজা চিত্রবর্ণকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে।

রাজ্যের রাজধানী হতে চারক্রোশ দূরে পাহাড়ী অঞ্চলের ঘন জঙ্গলে এক প্রাচীন কালীমন্দির আছে। রাজার সাহস-পরাক্রম-ধৈর্য পরীক্ষার জন্য রাজ্যের প্রথা অনুযায়ী রাজাকে প্রতিবৎসর একবার একাকী ওখানে দেবীপূজা করার জন্য আসতে হয়।

প্রথামত চিত্রবর্ণ অশ্বারোহণে মন্দিরের পথে চলেছে। জঙ্গলে প্রবেশ করে যখন মন্দিরের প্রায় নিকটবর্তী তখন একটা গাছের পিছন থেকে এক স্ত্রী-কণ্ঠের চীৎকার রাজার কানে আসে। সঙ্গে সঙ্গে রাজা অশ্বের গতি ঘুরিয়ে শব্দ যেদিক থেকে এল সেদিকে ছোটাল তার অশ্বকে। গিয়ে দেখে এক রাক্ষস এক বনবাসী স্ত্রীকে ধরে খাবার জন্য চেষ্টা করছে। অশ্ব হতে নেমে এসে চিত্রবর্ণ ত্বরিতে তরবারি হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "এই রাক্ষস, যদি সাহস থাকে তবে আমার সঙ্গে এসে লড়াই কর। আমাকে পরাজিত করে আমাকে খাও। একটা অসহায় নারীকে ধরে খাওয়া সাহস মোটেই নয়। অত্যন্ত নীচ এই কার্য।"

রাক্ষস চিত্রবর্ণকে বিস্ময়ে দেখে নিয়ে বলল, "আমার সঙ্গে লড়াই করতে চাইছ? তুমি নিজেকে এত বড় বীর মনে কর? ছিঃ, বকবক বন্ধ কর।"

ক্ষিপ্ত হয়ে চিত্রবর্ণ কাছে এল রাক্ষসের। রাক্ষস বনবাসিনীকে মাটিতে নামিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "সাবধান, পালাবার চেষ্টা ক'রো না। তুমি একজন নগণ্য মানুষ, আমি একটা রাক্ষস। রাক্ষসদের মধ্যেও উচ্চজাত আমার। আমি ক্ষুধার্ত হলেই অধর্মের পথ ধরি। অন্যথায় সর্বদাই ধর্মাচরণ করি। আমরা যদি সমান হতাম তাহলে তোমার সঙ্গে লড়াইয়ে মজা হ'ত। কিন্তু তোমার সঙ্গে নিজেকে সমান ভাবি কি করে? আমার সামনে তুমি অতি তুচ্ছ। এই বলে মুহূর্তে সে তার দেহ ছোট করে দেয়।

চিত্রবর্ণ চমকিত হলে রাক্ষস পুনরায় হেসে বলল, "আমি এখন একটা তরবারিও সৃষ্টি করতে পারব না, কারণ তার মন্ত্র স্মরণে আসছে না। এরজন্য অসিযুদ্ধ নয়, আমরা মল্লযুদ্ধ করব। তোমার তরবারি ত্যাগ কর।"

রাক্ষসের কথামত চিত্রবর্ণ তরবারি নীচে ফেলে দিয়ে মল্লযুদ্ধের জন্য রাক্ষসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেশ কিছু সময় দুজনে লড়াই চলে। যদিও রাক্ষসের শারীরিক বল যথেষ্ট, কিন্তু যুদ্ধের কলা-কৌশল জানে না। এই কারণে অল্পেতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। চিত্রবর্ণ এটা বুঝতে পেরে রাক্ষসের বুকে এবং গর্দানে প্রচণ্ডভাবে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে। ব্যথা-যন্ত্রণায় রাক্ষস মাটিতে পড়ে গিয়ে বলে ওঠে, "তুমি যেমনই সাহসী তেমনি বলবান ও পরাক্রমী।" তারপরেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

বনবাসিনী রাজার পায়ে ধরে বলে, "মহাশয়, আমার নাম গিরিকা। বন-সর্দারের কন্যা আমি। বনের চামেলী ফুল নেবার জন্য এখানে এলে রাক্ষস আমাকে ধরে। আপনি আমায় রক্ষা করেছেন। আপনার মত বীর আর নেই।"

রাজা হাসতে হাসতে তাকে উঠিয়ে তোলে। গলায় বীজের মালা, মাথার চুলে রঙবেরঙের পাখীর পালক—দেখে মনে হয় যেন বনদেবী। রাজা তার আপাদমস্তক দেখে। অদ্ভুত সৌন্দর্য তার দেহাবয়বে।

রাজা চিত্রবর্ণ অনেকক্ষণ নিষ্পলক নয়নে ওই সুন্দরীর সৌন্দর্য দেখে তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে মা কালীর মন্দিরের দিকে যাবার জন্য ফেরে। যাবার আগে ওই সুন্দরীকে বলে, "গিরিকা, আমি মা কালীর পূজা করতে মন্দিরে যাচ্ছি। এখন তুমি বাড়ী ফিরে যাও।"
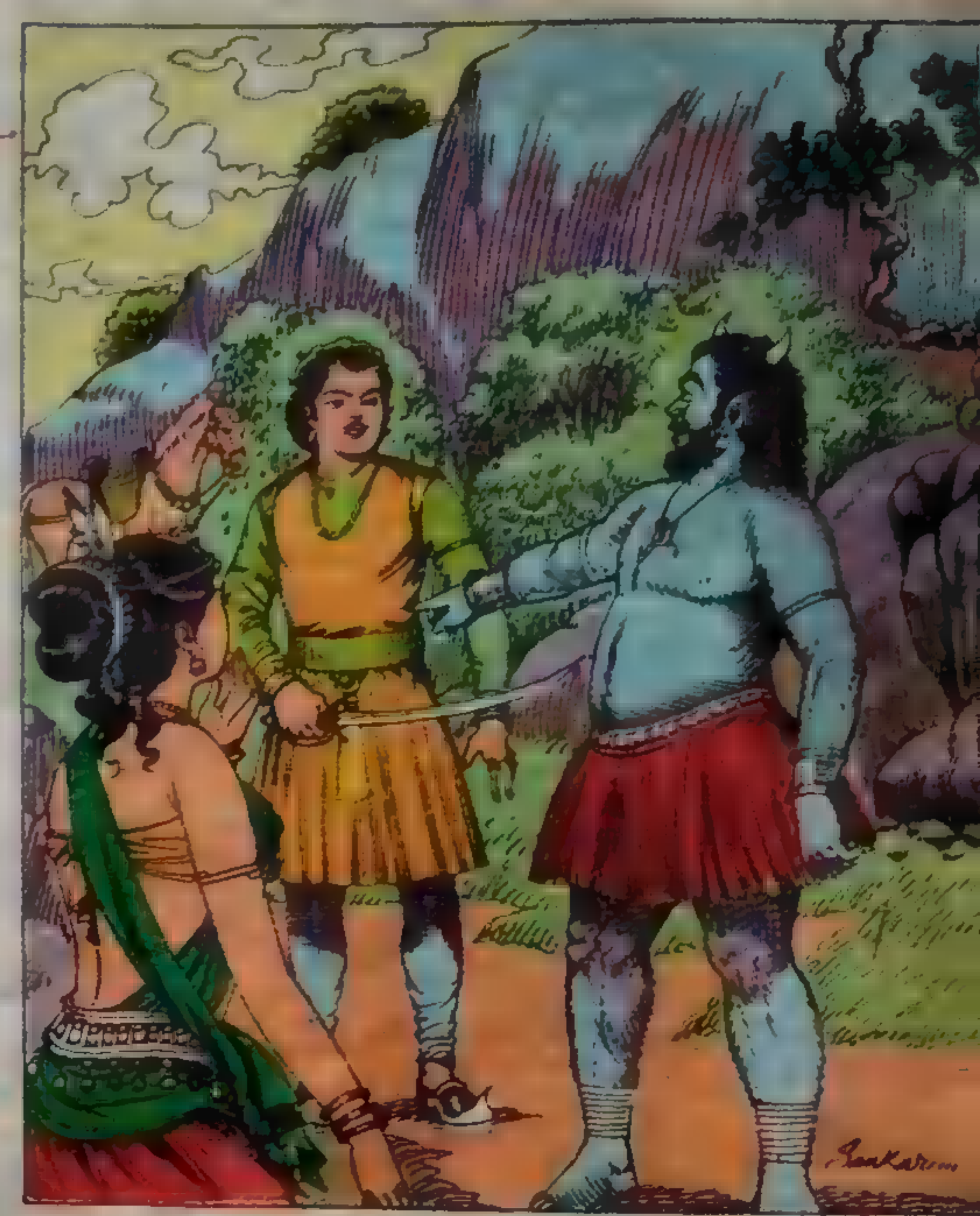
রাজা বলাসত্ত্বেও সে কোথাও গেল না। রাজাকে অনুসরণ করে দেবীমন্দিরে আসে এবং রাজার সাথে সাথে সেও মা কালীকে পূজা দেয়। পূজার শেষে রাজা বাইরে এসে ঘোড়ায় চড়ার জন্য এগিয়ে যায়। সুন্দরীও তার সাথে সাথে আসে।

চিত্রবর্ণের মনে হয়, গিরিকা বোধহয় তাকে কিছু বলতে চাইছে বলেই পিছন পিছন ঘুরছে। জিজ্ঞাসা করে, "বোধহয় তুমি আমায় কিছু বলতে চাইছ। নির্ভয়ে তুমি বল। আমি এই দেশের রাজা চিত্রবর্ণ।"

শুনেই গিরিকা স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর

যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে, "এতক্ষণ আমি ভাবতেই পারিনি যে আপনি মহারাজা। আমি জানি না, পূজান্তে দেবী কালীর কাছে আপনি কি প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছি।" নিরাশসুরে বলে সে।

রাজা গিরিকার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিছু বলতে যাবে, এমন সময় এক বনবাসী যুবক এসে বলে, "গিরিকা তুমি এখানে? তোমার জন্য আমি কোথায় না খুঁজেছি?" স্নেহভরা সুরে বলে।

যা ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গিরিকা যুবককে বলে, "ইনিই আমাকে রাক্ষসের কবল থেকে বাঁচান, ইনি আমাদের দেশের মহারাজা চিত্রবর্ণ।"

রাজাকে প্রণাম করে যুবক বলল, "মহারাজ, গিরিকাকে রক্ষা করে আপনি আমাদের অনেক উপকার করেছেন। রাক্ষস যদি গিরিকাকে সত্যি হরণ করে নিয়ে গিয়ে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করত তবে আমি আত্মহত্যা করতাম। আমি সত্য বলছি, গিরিকাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারব না।"

হেসে ফেলে রাজা চিত্রবর্ণ, "আচ্ছা! গিরিকার প্রতি তোমার ভালবাসার কথা তো আমি এখনই মাত্র শুনলাম। কিন্তু ও যে এরই মধ্যে আমাকে তার প্রাণের অধিক ভালবেসে ফেলেছে।"

গিরিকার দিকে ফিরে যুবক জিজ্ঞাসা করে, "গিরিকা, একি সত্যি?"

গিরিকা মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানায়। তখন রাজা দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে ওই বনবাসী যুবককে বলে, "এই সমস্যা সমাধানের একটাই পথ। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে আমি রাক্ষসকে হারিয়েছি, কিন্তু তোমাকে নয়। যদি তুমি মল্লযুদ্ধে আমাকে পরাজিত করতে পার, তাহলেই তুমি গিরিকাকে পাবে।"

রাজা চিত্রবর্ণের প্রস্তাবে বনবাসী যুবক সানন্দে তার স্বীকৃতি জানিয়ে মল্লযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

গিরিকার দিকে ফিরে রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি এতে সম্মতি জানাচ্ছ তো?" রাজার প্রশ্নে গিরিকাও সম্মতি জানিয়ে মাথা দোলায়। তারপরেই রাজা এবং বনবাসী যুবকের মধ্যে মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। চার-পাঁচ মিনিটের লড়াই হওয়ার পর বনবাসী যুবক রাজার পেটে দু-তিনটি জোর ঘুঁষি মারে। রাজা চীৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

কিছুপরে চিত্রবর্ণের জ্ঞান ফিরে এলে সে উঠে দাঁড়ায়। "গিরিকা আমি পরাজয় স্বীকার করছি। তুমি তোমার প্রেমিক যুবককে বিবাহ করে সুখী হও।" বলে রাজা ঘোড়ায় উঠে ক্ষিপ্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাজা চিত্রবর্ণের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজধানীতে বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। ঘোষণা করা হয়েছিল, বিজয়ীকে বহুমূল্যের পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রতিযোগিতার সমাপ্তিদিবসে মল্লযুদ্ধে গিরিকার সেই প্রেমিককে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বহু দূরদেশ হতে আগত সমস্ত প্রতিযোগীকে সে হারিয়েছে। যুবককে রাজা চিত্রবর্ণ পুরস্কার প্রদান করবে। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে রাজা চিত্রবর্ণ সেই বনবাসী যুবকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসে।

রাজার ব্যবহারে কেবল সেখানে উপস্থিত জনতাই আশ্চর্য হয় না; গিরিকাও সেখানে উপস্থিত ছিল, সেও খুব ঘাবড়ে যায়। তবে গিরিকা নিশ্চিত যে এই যুদ্ধে তার প্রেমিকেরই জয় হবে; উৎসাহ নিয়ে পুনরায় রাজার পরাজয় দেখার জন্য তৈরী হয়ে বসে। কিন্তু রাজা চিত্রবর্ণের মল্লযুদ্ধের কলাকৌশল এবং তার শক্তি-সামর্থ্যের তুলনায় যুবক অতি নগণ্য, সে রাজার সামনে নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। অল্পসময়ের মধ্যে যুবক পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

বেতাল তার কাহিনী সমাপ্ত করে রাজা বিক্রমাদিত্যকে প্রশ্ন করে, "রাজন,
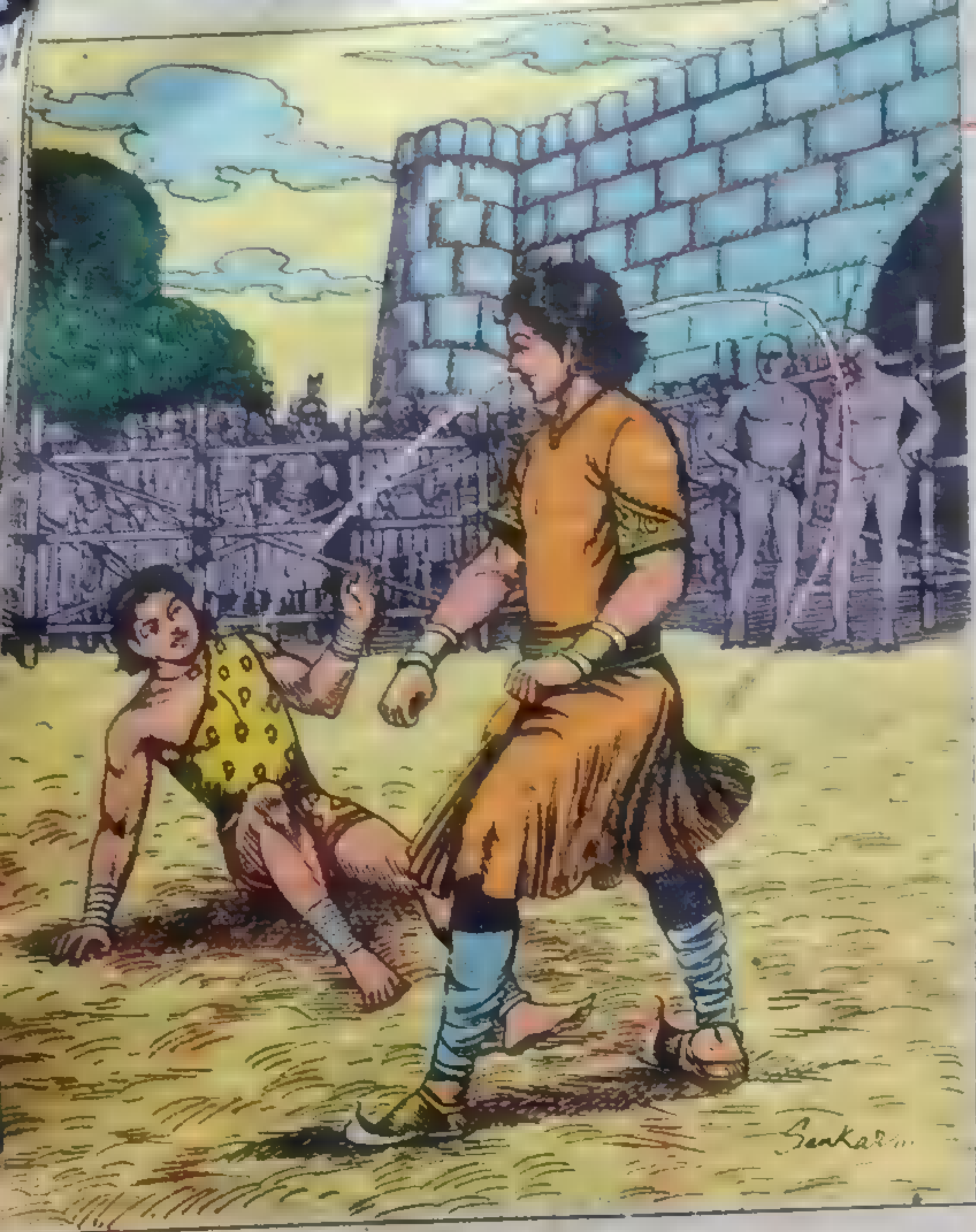
বনবাসিনী গিরিকার ব্যাপারে রাজা চিত্রবর্ণের বক্তব্য ও ব্যবহার দেখে মনে হয় না কি যে রাজা চিত্রবর্ণ হচ্ছে অস্থির বুদ্ধিসম্পন্ন এবং একেবারে সময়বোধশূন্য। রাক্ষসের কবল থেকে মুক্ত করার পর বনবাসিনী গিরিকার সৌন্দর্য দেখে সে এত মুগ্ধ হয়ে গেল যে নির্বাক নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকে দেখতে থাকে। এতেই কি বোঝা যায় না যে, গিরিকাকে বিবাহ করার জন্য তার ছিল প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু বনবাসী যুবক আবির্ভূত হয়ে যখন গিরিকার সম্পর্কে তার গভীর প্রেমের কথা ব্যক্ত করে, তখনই রাজার মনোভাবে পরিবর্তন আসে। এবারে আসছি তার বীরত্ব সম্বন্ধে। রাক্ষস রাজাকে মল্লযুদ্ধের জন্য আহ্বান জানিয়ে তার দেহকে স্বাভাবিক মানুষের মত করে নেয়। কারণ সেটাই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু যদি এরকম না করত তবে রাজা চিত্রবর্ণ কোনভাবেই রাক্ষসকে পরাজিত করতে পারত না। তার চঞ্চল স্বভাবের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে, যখন সে বনবাসী যুবকের সাথে মল্লযুদ্ধ করার জন্য মন স্থির করে। রাজা এই মনোভাব গ্রহণ করে যখন যুবক আর সকল যোগদানকারী মল্লযোদ্ধাদের পরাজিত করে। জঙ্গলের মধ্যে যুবককে সে নিজে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে নিজেই পরাজিত হয়। পুনরায় সেই যুবককে পরাজিত করার যে প্রয়াস তা কি প্রমাণ করে না যে রাজার মনে ওই যুবকের প্রতি ঈর্ষা দানাবদ্ধ হয়েছিল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল? আমার এই সন্দেহের উত্তর জানা থাকা সত্ত্বেও যদি তুমি মৌন থাক তবে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

বেতালের প্রশ্নের উত্তরে রাজা বিক্রমাদিত্য বলে, "জঙ্গলের মধ্যে যখন রাজা চিত্রবর্ণের বনবাসিনীর সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং পরিচয় হয় তখন থেকে যা যা ঘটনা ঘটেছে তাদের কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না, আর সেভাবে দেখাও অনুচিত হবে। সমস্ত ঘটনাকে একটি সূত্রে বন্ধন করেই তার সম্বন্ধে চিন্তা করা ভাল। রাক্ষসের দেহ ছিল বিশাল, পর্বতের ন্যায়। ওই বিশাল দেহ দেখেও রাজা ভীত হয়ে পড়েনি। মুক্ত তরবারি হাতে তাকে আক্রমণের জন্য ছুটে গিয়েছে। এটাই স্পষ্ট প্রমাণ যে, রাজা নিঃসন্দেহে একজন সাহসী বীর ছিল। রাক্ষস তার দেহের আকার ছোট করে, এ তো কেবল তারই ন্যায়ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, এতেই রাক্ষসের বিশ্বাস ছিল। রাজার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? রাজা অদ্ভুত এক সুন্দরীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে অবশ্যই, কিন্তু এটা বিবেচনা করা মোটেই সঙ্গত নয় যে রাজা তাকে বিবাহ করতে চাইছিল। যদি এরকমই তার বাসনা হ'ত তবে বনবাসী যুবককে মল্লযুদ্ধে হারিয়ে সহজেই সে গিরিকাকে বিবাহ করতে পারত। কিন্তু রাজা বুঝেছিল যে তার শৌর্য ও বীরত্বের প্রতি গিরিকা আকর্ষিত হয়েই তার পত্নী হবার জন্য উতলা হয়ে পড়েছিল। গিরিকার এই আকর্ষণ মোহ ছেদন করার জন্যই স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করে।

এর পরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ওই বনবাসী যুবককে সহজে পরাজিত করা রাজনীতির এক অভিন্ন অঙ্গ। যদি জনতার সামনে রাজা ওই যুবককে পরাজিত না করে পুরস্কার প্রদান করত, তবে কোন-না-কোন সময়ে যুবক অবশ্যই প্রচার করত যে জঙ্গলের মধ্যে রাজাকে মল্লযুদ্ধে বিশ্রীভাবে সে হারিয়ে দিয়েছে। একজন বীর পরাক্রমশালী রাজার কাছে এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে? একথা ভেবেই রাজা চিত্রবর্ণ সকলের উপস্থিতিতে ওই বনবাসী যুবককে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে অতি সহজে পরাজিত করে। এরপর আর যুবকের পক্ষে মিথ্যা প্রচারের কোন সুযোগ থাকল না। এসবের পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে রাজা চিত্রবর্ণের যথেষ্ট সময় সম্বন্ধে জ্ঞানবোধ ছিল এবং কোন্ সময়ে প্রয়োগ করতে হবে তার জ্ঞানও ছিল। তার স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত দৃঢ়, মহাশক্তিশালী সে। ঈর্ষা বা প্রতিশোধ গ্রহণের কোন ইচ্ছা তার ছিল না।"

উত্তরদানের ফলে মৌনতা ভঙ্গ হওয়ায় বেতাল শবদেহ নিয়ে পূর্বোক্ত বৃক্ষে আশ্রয় নেয়।

(কল্পিত)

সত্য হল উল্টোভাবে

জমিদার রবীনঠাকুর অতশত বোঝে না, লোকের [illegible] ওঠে বসে। একদিন তার বন্ধু উদয়ভানুর সাথে বসে দাবা খেলছিল। সে-সময়ে একজন লোক এসে বলে, "মালিক, আমি একজন মাহুত। আমার একটা হাতী আছে। আজকাল ওকে দিয়ে আমার আর তেমন আয় হয় না। বরং বেশি খরচ হয় ওর জন্য। আপনার মত ধনীদের কাছে বিক্রি করতে চাইছি আমি।"

রবীনঠাকুর উদয়ভানুর দিকে তাকায়, অর্থ এমতাবস্থায় তার কি করণীয়।

উদয়ভানু বলে ওঠে, "বিলম্ব কেন তবে? প্রবাদ আছে, হাতী বেঁচে থাকলেও লক্ষ টাকা, আর মরলেও লক্ষ টাকা।"

"তুমি কি বলতে চাইছ?" রবীনঠাকুর জিজ্ঞাসা করে।

"হাতী যখন জীবিত থাকে তখন বহু কর্মে লাগে। মরে যাবার পর ওটার দাঁত বিক্রি করে অনেক লাভ করতে পারবে।" উদয়ভানু বলে।

রবীনঠাকুর হাতীটি কিনে নেয়। কিছু সময় কেটে যায়। একদিন উদয়ভানু রবীনঠাকুরকে দেখতে এসেছে। এসে দেখে কিছু লোক একটা মরা হাতী কোনক্রমে টেনে টেনে জমিদারবাড়ীর বাইরে বের করছে।

রবীনঠাকুর বন্ধু উদয়ভানুকে মৃত হাতীটিকে দেখিয়ে বলে, "তুমি আমাকে আগেই কেন বলনি যে মেয়ে-হাতীর দাঁত হয় না। তোমার কথা সত্য হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে। একে এই কটা দিন পালন করতেই আমার লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। আবার এর শবদেহের সংকারেও লক্ষটাকা ব্যয় হবে!" অশ্রুসজল নয়নে জানাল রবীনঠাকুর বন্ধু উদয়ভানুকে।
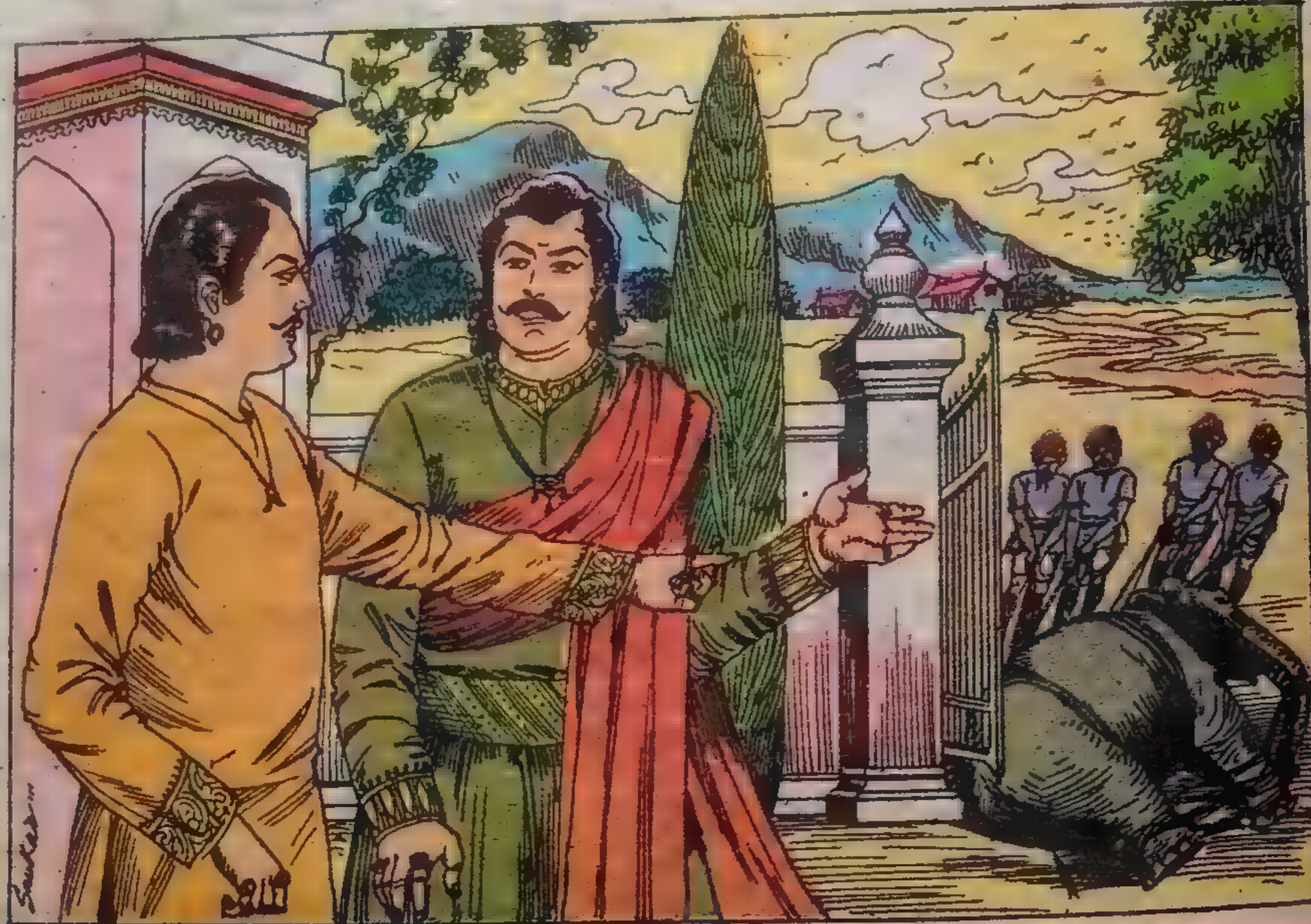
ভারতীয় পশুপক্ষী

হিমালয়ের গরু

চমরী গাই বা 'ইঅ্যাক'-কে বলা যায় 'পার্বত্য গরু'। ভারতে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তরপশ্চিমের কাশ্মীর হতে উত্তরপূর্বের সিকিম-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই গবাদি পশুটিকে দেখা যায়।

ইঅ্যাক দেখতে ঠিক গরুর মত, আকারে একটু বড়। একটা গাই-এর উচ্চতা ১৭০ থেকে ১৮৫ সেমি. হয়ে থাকে। বলিষ্ঠ ভারী দেহ নিয়ে অনায়াসে পার্বত্য ঢাল বেয়ে উপরে উঠে যেতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৪৩০০-৬০০০ মিটার উঁচুতেই সাধারণত এদের বাস।

একসময়ে বন্যপ্রাণীরূপে পরিগণিত হলেও এখন গৃহপালিত জন্তুরূপেই পরিচিত। মাল বহনের বা আরোহী বহনের কাজেই পার্বত্যাঞ্চলে এদের ব্যবহার বেশি। গবাদি পশুর ন্যায়ই এরা পালিত হয় এবং দুধও দেয়। দলবদ্ধভাবেই এরা থাকতে ও চরতে ভালবাসে।

দেহের রঙ কালো; লম্বা ঘন চুল বা লোমে সারা দেহ আবৃত। ভীষণ ঠাণ্ডা হতে এই চুলই তাদের রক্ষা করে। চমরী গাই এবং সাধারণ গরুর সংমিশ্রণে 'মিথুন' নামে পরিচিত এক সঙ্করজাতীয় জন্তুর জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান ভারতের শিল্পী-কথা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"আমি লক্ষ্য করেছি, যখনই একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য তোমরা অঙ্কিত করতে চাও, তখনই তোমাদের ছুটতে হয় কোন বাগানে বা নদীকূলে, আর ওখানে গিয়ে পর্যবেক্ষণের দ্বারা তোমরা বৃক্ষ-লতা-উদ্ভিদ, পুষ্প এবং জীবজন্তুকে আঁকতে শুরু কর। সৌন্দর্যকে শিল্পে প্রকাশ করার জন্য তোমাদের এই সহজ প্রয়াস দেখে আমার বিস্ময় জাগে। একবারও কি তোমাদের অনুভূতিতে আসে না যে সৌন্দর্য কোন বাইরের দৃশ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে না, সেটা থাকে অন্তরের গভীরে? কালিদাসের কাব্য-ঝর্ণাধারায় নিজেদের অন্তরকে সিক্ত করে নাও, তারপর ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেরাও। তখনই তুমি চিরনবীন মেঘদূতের চলার ছন্দকে অনুভব করতে পারবে। মহান কবিমনীষী বাল্মীকির সাগরের বর্ণনায় নিজেদেরকে সিঞ্চিত করে নাও, তারপরে আরম্ভ কর তোমার নিজের কল্পনার সাগরকে শিল্পে রূপ দিতে।"

শিষ্যদের প্রতি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ ছিল এরকমই। এরকম উক্তির মধ্যেই শিল্পসৃষ্টিতে তাঁর নিজস্বতার প্রকাশ পায়। শিল্পের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার পূর্বে শিল্পীর আপন বৈশিষ্ট্যকেই খুঁজে নিতে হবে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের যে সময়ে তাঁর জন্ম হয় সে সময়ে তাঁদের ঠাকুরপরিবার খ্যাতির ঔজ্জ্বল্যে দেশে-বিদেশে ভাস্বর হয়েছিল। যুবাবয়সে অবনীন্দ্রনাথ প্রথমে একজন ইংরেজ-শিল্পীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হলেও পরে একজন ইতালীদেশীয় শিল্পীর প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি তখন পাশ্চাত্য-দেশীয় শিল্পের অনুকরণে আঁকা শুরু করেন। কিন্তু পরে খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সমালোচক ই.বি. হ্যাভেল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকেই তাঁর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আসে। তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সম্মুখে ভারতীয় শিল্পের মহান বৈশিষ্ট্যকেই কেবলমাত্র তুলে ধরেননি, ভারতীয় শিল্পের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধেও ভারতীয়দের সজাগ করে দিয়েছেন।
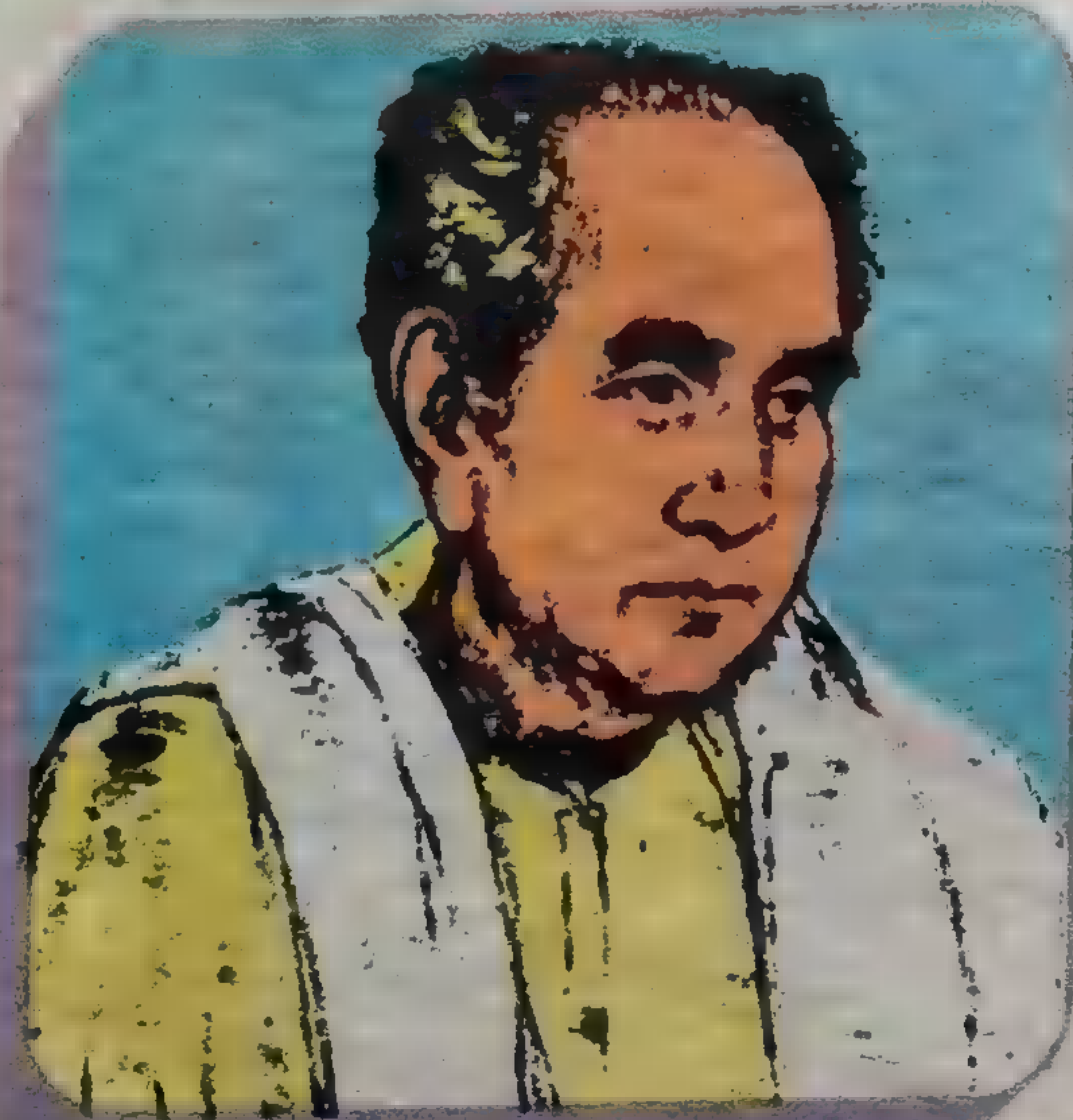
প্রাচীন ভারতের শিল্পশৈলীর মূল নীতিকে পুনরায় আবিষ্কার করার জন্যই অবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভাকে উজার করে দেন। শিল্প রচনায় সুবিধার জন্য তিনি ইওরোপীয় শিল্পরীতিকে ব্যবহার করলেও তাঁর ভাবনা ছিল সম্পূর্ণ দেশীয়। 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট' নামে তিনি একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। বহু শিল্পী তাঁর শিল্পরীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন, তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু অন্যতম।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন।

প্রশ্ন কয়টির উত্তর জানা আছে কি?

১। কোন্ বৎসরে ভারতের রাজ্যগুলোর পুনর্গঠন করা হয়?
২। গত ১০ বৎসর যাবৎ কোন্ দেশ আণবিক অস্ত্র মুক্ত হয়ে রয়েছে?
৩। কোন্ রাজার শাসনকালে 'পঞ্চতন্ত্র' গল্পগুলো সঙ্কলিত হয়েছে?
৪। 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফাণ্ড ফর নেচার' তাদের প্রতীকস্বরূপ কোন্ জন্তুকে চিহ্নিত করেছে?
৫। আমাদের দেশে রেলওয়ে বগি তৈরীর কারখানা কোথায় অবস্থিত?
৬। সর্বসাধারণে ব্যবহৃত কোন্ যান আবহাওয়াকে সর্বাপেক্ষা কম দূষিত করে?
৭। ভারতের কোন্ রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি কয়লা উৎপন্ন হয়?
৮। 'ব্লু চিপ' কি?
৯। স্বর্গে অবস্থিত দেবরাজ ইন্দ্রের রাজধানীর নাম কি?
১০। কোন্ সময়ে আয়াতুল্লা খোমেইনি ইরাণের ক্ষমতায় আসেন?
১১। ভারতে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকা শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে। কয়টি পত্রিকা?
১২। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক কবে দেওয়া হয়েছিল?
১৩। কোন্ মুসলমান নবাব সর্বপ্রথম দেবনাগরী অক্ষরে খোদিত মুদ্রার প্রচলন করেন?
১৪। ইউরোপের দীর্ঘতম নদী কোন্‌টি?
১৫। কোন্ শস্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করে ভারতে 'সবুজ বিপ্লব' শুরু হয়েছিল?
১৬। সর্ববৃহৎ গ্রহ কোন্‌টি?

উত্তরমালা

১। ১৯৫৬ সাল।
২। নিউজিল্যাণ্ড।
৩। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে।
৪। পাণ্ডা—বিখ্যাত ভল্লুক।
৫। মাদ্রাজের সন্নিকটে পেরাম্বুর।
৬। সাইকেল।
৭। বিহার।
৮। বিখ্যাত উন্নয়নঃ। কোন সুপ্রতিষ্ঠিত উৎপাদন সংস্থার 'শেয়ার'।
৯। অমরাবতী।
১০। ১৯৭৯ সালে।
১১। ৩৬টি পত্রিকা।
১২। ৮ আগস্ট, ১৯৪২।
১৩। শের শাহ্।
১৪। ভলগা।
১৫। গম।
১৬। বৃহস্পতি, পৃথিবীর তুলনায় ১১ গুণ বড়।
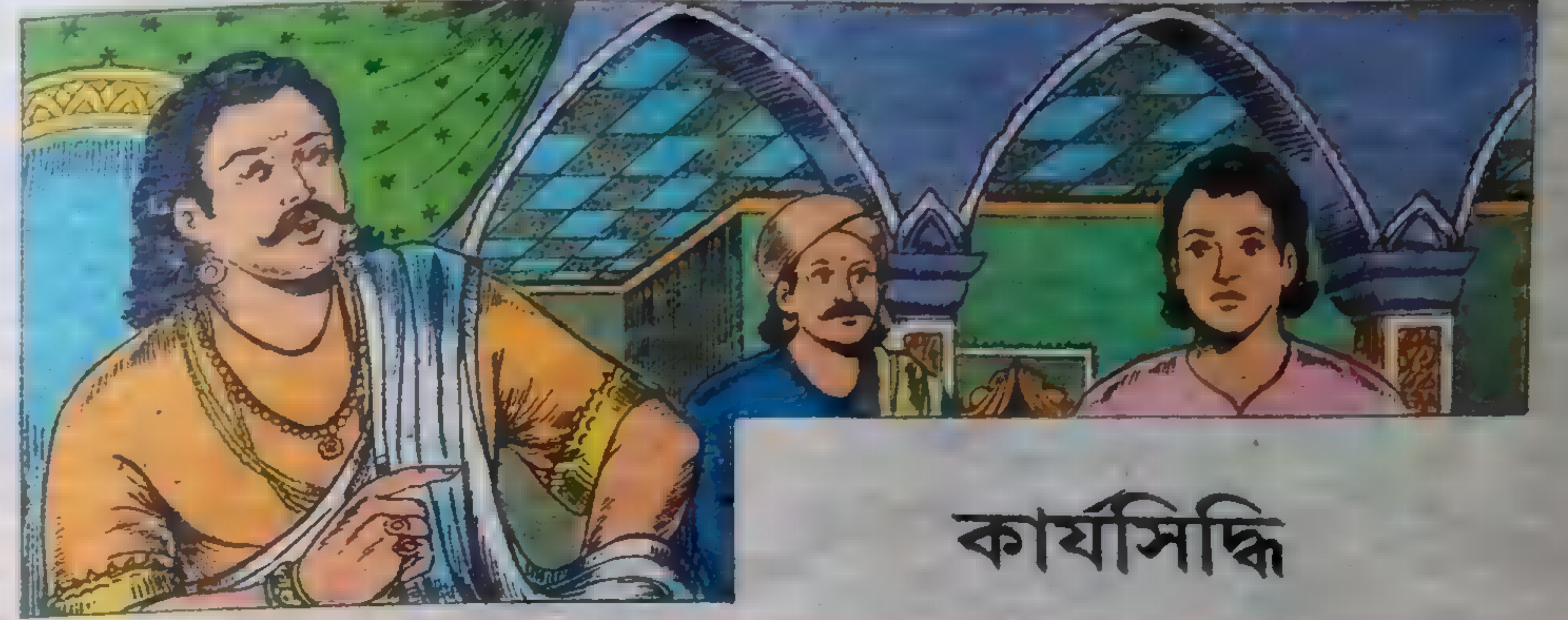
কার্যসিদ্ধি

জমিদার শ্রীকান্তের এমন একজন যোগ্য কর্মচারীর প্রয়োজন যে জমিদারীর অধীনে সমস্ত কৃষিসংক্রান্ত কার্যকলাপ দেখাশোনা করতে পারবে। এর সাথে সাথে তাকে খাজাঞ্চিতে আসাযাওয়া করে যারা, তাদের উপরেও নজর রাখতে হবে। অত্যন্ত বিশ্বাসের সাথে এবং নিজের মর্যাদা রক্ষা করে সকলের সাথে সদ্ভাব রাখার যোগ্যতা তার থাকতে হবে। নারায়ণ এতদিন দক্ষতার সাথে এই দায়িত্বভার পালন করে এসেছে। কিন্তু তার আকস্মিক মৃত্যুতে জমিদারের সামনে ভয়ানক সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে যে কে এখন এই দায়িত্বভার নেবার উপযুক্ত হবে।

এই ব্যাপারে জমিদার তার দেওয়ানের সাথে সবিস্তারে আলোচনা করে। বহু বিবেচনার পর দেওয়ান বলে, "মহোদয়, আমার বিশ্বাস যে নারায়ণের পুত্র শশাঙ্ক এই কাজের জন্য যোগ্য হবে।"

পরের দিন শশাঙ্ক নিজেই জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিবেদন করে তার পিতার স্থলে তাকে যেন নিয়োজিত করা হয়। জমিদারের সিদ্ধান্ত, ওই পদে শশাঙ্কের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা এবং কার্যদক্ষতার পরিচয় নিয়ে তবেই তাকে নেওয়া হবে। এই কারণে দুইদিন পরে পুনরায় শশাঙ্ককে আসতে বলে। জমিদারের কথামত শশাঙ্ক দুদিন পরেই এসে হাজির হয়।

জমিদার তাকে জানাল, "তোমাকে চাকুরী দেওয়ার কথা পরে ভাবব। তার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আজ বিকেলে আমার মেয়ে তার শ্বশুরবাড়ী যাবে। আমি শহরে এক জহুরীর কাছে বহু মূল্যবান এক অলঙ্কার তৈরীর কাজ দিয়েছিলাম। অলঙ্কারটি বানিয়েও দিয়ে গেছে আমার কাছে। সেটা দেখে আমার কন্যা বলেছে, যদি তাতে কিছু সামান্য পরিবর্তন করা যায় তাহলে অলঙ্কারটি

অঞ্জন মাইতি

আরো সুন্দর হয়ে উঠবে। তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে আমার মেয়ে যেরকম পরিবর্তন করতে বলেছে, করাতে হবে। তার শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পূর্বেই কাজটা করিয়ে তোমাকে ফিরে আসতে হবে।"

জমিদার-কন্যার সাথে দেখা করে শশাঙ্ক জেনে নেয় তার কাছে, গহনাটির কোথায় কি পরিবর্তন করতে হবে। শহরের নির্দিষ্ট দোকানে গিয়ে জহুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

জহুরী শশাঙ্কের মুখে সমস্ত শুনল, অলঙ্কারটি দেখে বলল, "আমি মনে করতে পারছি না আপনি কোন্ জমিদারের কথা বলছেন। কত জমিদার, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ধনীব্যক্তি এখানে অলঙ্কারাদি কেনার জন্য আসাযাওয়া করেন। যিনিই হোন, যে পরিবর্তন আপনারা চান আমার কর্তব্য অবশ্য তা করে দেওয়া। কিন্তু প্রথমে আমাকে প্রমাণ দেখাতে হবে যে, আমাদের এখান থেকেই কেনা এটি।"

জমিদার সেরকম কোন প্রমাণ-পত্র বা খরিদ-পত্র শশাঙ্ককে দেয়নি। সে যদি পুনরায় এর জন্য জমিদারের কাছে গিয়ে ফিরে আসে তাতে অযথা পরিশ্রম হবে এবং সময়ও প্রচুর যাবে। সঠিক সময়ের মধ্যে কাজটি করান অসম্ভব।

এই পরিস্থিতিতে শশাঙ্ক পুনরায় জহুরীর সাথে আলাপ করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু জহুরী তার মত থেকে একবিন্দুও সরতে চায় না। স্পষ্ট বলে সে, "যে জিনিস আপনারা আমাদের কাছ থেকে কিনেছেন তার কোন প্রমাণ আমরা অবশ্য দেখতে চাই। আমরা সন্তুষ্ট হলে তৎক্ষণাৎই আমরা কাজটি করে দেব। আপনি নিজেই দেখছেন, আমরা কত ব্যস্ত। অন্য কাঁরো কাছ থেকে কেনা অলঙ্কার আমাদের কাছে পরিবর্তন করে ঠিক করতে দিলে অন্তত এক সপ্তাহ সময় লাগবে।"

জহুরীর কথাবার্তা শুনে শশাঙ্ক বলল, "ঠিক আছে, আমি এই গহনাটি বিক্রয় করতে চাইছি। এটি কিনতে নিশ্চয়ই আপনার কোন অসুবিধা হবে না।"

"এত বড় একটা কথা আপনি বলে দিলেন! বংশপরম্পরায় আমরা গহনাদির ব্যবসা করে আসছি। গহনা কেনা-বেচাই আমাদের কাজ। ভাল গহনা কিনতে অসুবিধা কোথায়? দেরীই বা করব কেন?" বলে শশাঙ্কের কাছ থেকে গহনাটি নিয়ে তার ওজন দেখে মূল্য কষে সঙ্গে সঙ্গে দাম দিয়ে দেয়। দাম মিটিয়ে দিয়ে গহনাটি পুনরায় বিক্রির জন্য অন্যান্য গহনার সাথে সাজিয়ে রাখে।

দাম নিয়ে শশাঙ্ক দোকান থেকে বেরিয়েই পুনরায় ফিরে আসে, যেন তার মাথায় কোন উপায় এসেছে। সোজা জহুরীর কাছে গিয়ে বলে, "মহাশয়, কি কারণে ক্ষণিকের জন্য আমার বুদ্ধিবিভ্রাট হয়ে যাওয়ায় আপনার কাছে আমি গহনাটি বিক্রি করে দিই। কিন্তু সত্যি, আমি সেটা বিক্রি করতে চাই না। আমি ওটাকে পুনরায় কিনতে চাই। তবে তাতে ছোট ছোট কয়েকটা পরিবর্তন করে দিতে হবে।"

জহুরী খুশিতে বলে ওঠে, "আমাদের দোকানে গহনা কেনার জন্য আপনার মত ক্রেতা আমাদের কাছে লক্ষ্মী, অত্যন্ত আদরণীয়। যেরকম পরিবর্তন চাইছেন সেরকম করে দেওয়া আমাদের পরম কর্তব্য।" তারপর গহনা-তৈরীর লোককে ডেকে সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের জন্য দিয়ে বলল তখনই করে দিতে।

আধ-ঘণ্টার কিছু বেশি সময়ের মধ্যে আবশ্যক পরিবর্তন হয়ে যায় গহনাতে। তখন শশাঙ্ককে জহুরী বলে, "মহাশয়, আমি যে মূল্যে আপনার কাছ থেকে অলঙ্কারটি কিনেছি, আর যে মূল্যে আমি আপনাকে এখন বিক্রি করব, তাতে সামান্য তফাত হবে। এই ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য একশ টাকা বেশি দিতে হবে।"

গহনাতে কন্যার পছন্দমত পরিবর্তন করার জন্য মজুরী হিসাবে জমিদার একশ টাকা দিয়েছিল শশাঙ্ককে। সুতরাং দোকানের মালিক যা চেয়েছে তাই তার কাছে আছে। সানন্দে টাকা দিয়ে গহনা নিয়ে সে ফিরে আসে জমিদারের কাছে।

আসলে জমিদার ও জহুরী, দুজনেই দুজনের পরিচিত। জমিদারের নির্দেশমতই জহুরী গহনায় কোন পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেছিল।

শশাঙ্কের মুখ থেকে জমিদার শোনে যা যা ঘটনা ঘটেছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে শশাঙ্ক কার্য করার দক্ষতা রাখে। জমিদার তাকে তার পিতার শূন্যপদে নিযুক্ত করে সেদিন থেকেই।

শিল্পী ও শিল্পকলা

অনেকদিনের কথা। বিন্ধ্যপর্বতের নিকটে শিলানন্দ নামে একজন শিল্পী ছিলেন। তাঁর তৈরী শিল্পে যেন প্রাণের প্রকাশ ঘটত। দেখে মনে হ'ত যেন সজীব মূর্তি, প্রাণের স্পন্দন এখনই ফুটে উঠবে। তিনি ছিলেন শিল্পাচার্য, অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শিল্পশিক্ষার জন্য।

অমরেন্দ্র এবং ভূপেন্দ্র শিলানন্দের কাছে আসে ভাস্কর্য-শিক্ষার উদ্দেশ্যে। দশবৎসর তাঁর কাছে থেকে তারা শিল্পকলা শিক্ষালাভ করে।

শিক্ষা সমাপন করে তারা যখন বিদায় নেবে তখন আচার্য তাদের বলেন, "বৎস, তোমাদের মত শিষ্যকে পাওয়া সৌভাগ্য। তোমরা যা আয়ত্ত করেছ তা অবশ্যই তোমাদের যোগ্য শিষ্যদের দান করবে। প্রতিফলের কোন প্রতীক্ষা করবে না। ভবিষ্যতে তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই সুযোগমত সাক্ষাৎ হবে।"

ভূপেন্দ্র বাড়ী ফিরে আসে। গ্রামে তাদের পাঁচ একর জমি আছে, কৃষিকার্যে যা আয় তা দিয়ে আরামে জীবন কাটাতে পারে। নাট্যশাস্ত্রে পারদর্শিনী মীনাক্ষীকে সে বিবাহ করে, আশা যে সে তাকে তার শিল্পসৃষ্টিতে প্রেরণা ও উৎসাহ দান করতে পারবে।

কেহ যদি ভূপেন্দ্রের কাছে শিল্পশিক্ষা লাভ করতে আসত, তবে তাদের থেকে সহজে কোন প্রতিদান গ্রহণ করত না। প্রচুর শিষ্য তার কাছে এসে জমা হয়েছে শিল্প-শিক্ষার জন্য। তাদের শিক্ষাদানে ভূপেন্দ্র খুবই পরিশ্রম করে। একটুও সময় পেত না বিশ্রামের জন্য, তবু কখনও কারো উপরে বিরক্ত হ'ত না, কখনও তার ক্লান্তি আসত না। বহুদূর পর্যন্ত তার সুখ্যাতি প্রচারিত হয়ে পড়ে।

অনেক বৎসর অতিক্রান্ত হয়। একদিন সে-দেশের রাজার এক ঘোষণা ঘোষিত হয়: দেবনর্তকী মেনকার সৌন্দর্য ও ভঙ্গিমা ভাস্কর্যশিল্পে যে ফুটিয়ে তুলতে পারবে তাকে এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেবে। রাজধানীতে নতুন নৃত্যমন্দির নির্মাণ হচ্ছে, সেই ভবনে ওই ভাস্করমূর্তি স্থাপনা করা হবে। ওই ঘোষণাতে আরো বলা হয়, নির্মীয়মাণ নাট্যমন্দিরের জন্য বহু শিল্পীর আবশ্যক।

ভূপেন্দ্র তার আপন শিক্ষার্থীদের নৃত্যমন্দির নির্মাণের কাজের জন্য পাঠিয়ে নিজে মেনকার মূর্তি নির্মাণে মন দেয়। কিন্তু একদিন তার শিষ্য-শিক্ষার্থীরা ফিরে এল। কারণ, মন্দিরের নির্মাণকার্যে নিযুক্তির পূর্বে আগত শিল্পীদের নির্বাচনের জন্য একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন রাজা, তাতে তারা উত্তীর্ণ হয়নি।

শিষ্যদের আশ্বস্ত করে ভূপেন্দ্র তাদের বলে, "চিন্তা ক'রো না বা দুঃখ বোধ ক'রো না। তোমাদের ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব আমার। অপূর্ব মূর্তি আমাকে গড়ে তুলতে হবে।"

মেনকার মূর্তি গড়নের কাজে সে একান্তভাবে মনোনিবেশ করে। মূর্তি-তৈরী সম্পূর্ণ হতে তিন বৎসর লেগে যায়। আরো একমাস সে মূর্তির শেষ কাজটুকুও করতে সময় নেয়। এরপরেই খবর আসে রাজ-ধানীতে নৃত্যভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাড়াতাড়ি গরুরগাড়ীতে করে মেনকার মূর্তি নিয়ে রওনা দেয় রাজধানীর দিকে।

দুইদিন চলার পর অমরেন্দ্রের বাড়ী যে গ্রামে সেখানে এসে পৌঁছয়। বেশ বড় গ্রাম। কিন্তু সেখানে অমরেন্দ্রের সম্বন্ধে কেউ কোন খোঁজ দিতে পারল না। শেষে এক যুবক অনেক ভেবে বলল, "ও, সেই শিল্পীর কথা বলছেন? আপনি কি তার কাছ থেকে কোন শিল্পমূর্তি ক্রয় করতে চাইছেন? ওনার কাছ থেকে ক্রয় করা আপনার দ্বারা হবে না। অর্থের প্রতি তার দারুণ লোভ।" বলে সে তার বাড়ী দেখিয়ে দেয়।

অমরেন্দ্র এত পয়সা উপার্জন করে কিন্তু তার বাড়ী-ঘরের চেহারা অতি সাধারণ। কারোর পছন্দমত কোন মূর্তি গড়ে বা নিজের খেয়ালে সৃষ্ট মূর্তি বিক্রয় করে, দুই-এরই মূল্য অনেক। যে তার কাছে ভাস্কর্য-শিল্প শিক্ষালাভ করতে আসে, তার কাছেও অনেক অর্থ সে দাবি করে। এরজন্য শিষ্য-শিক্ষার্থীর সংখ্যা অল্প। সেও রাজার ঘোষণামত নৃত্যমন্দিরের জন্য মেনকার মূর্তি নির্মাণে ব্যস্ত হয়েছিল।

আইভি ব্যানার্জী

সমস্ত কিছু ভালভাবে জেনে নিয়ে ভূপেন্দ্র অমরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে, "যখন আমরা শিক্ষা সমাপন করে বাড়ী ফিরে আসছিলাম, সেসময়ে শিল্পাচার্য গুরু আমাদের কি বলেছিলেন তা মনে নেই? তিনি বলেননি, কখনও প্রতিফলের আশা রাখবে না।"

"নিশ্চয়ই মনে আছে। তাঁর প্রতিটি বাক্য আমাদের শিরোধার্য। প্রতিফলের প্রতিই যদি আমার দৃষ্টি থাকত, তবে আমি আরো স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারতাম। আমার এখন লক্ষ মুদ্রা থাকলেও এক সামান্য জনের মত বাস করি। আমাদের বাড়ীতে কোন চাকর-চাকরানী নেই, সমস্ত কাজ আমরা নিজেরাই নিজেদেরটা করি।" অমরেন্দ্র উত্তর দেয়।
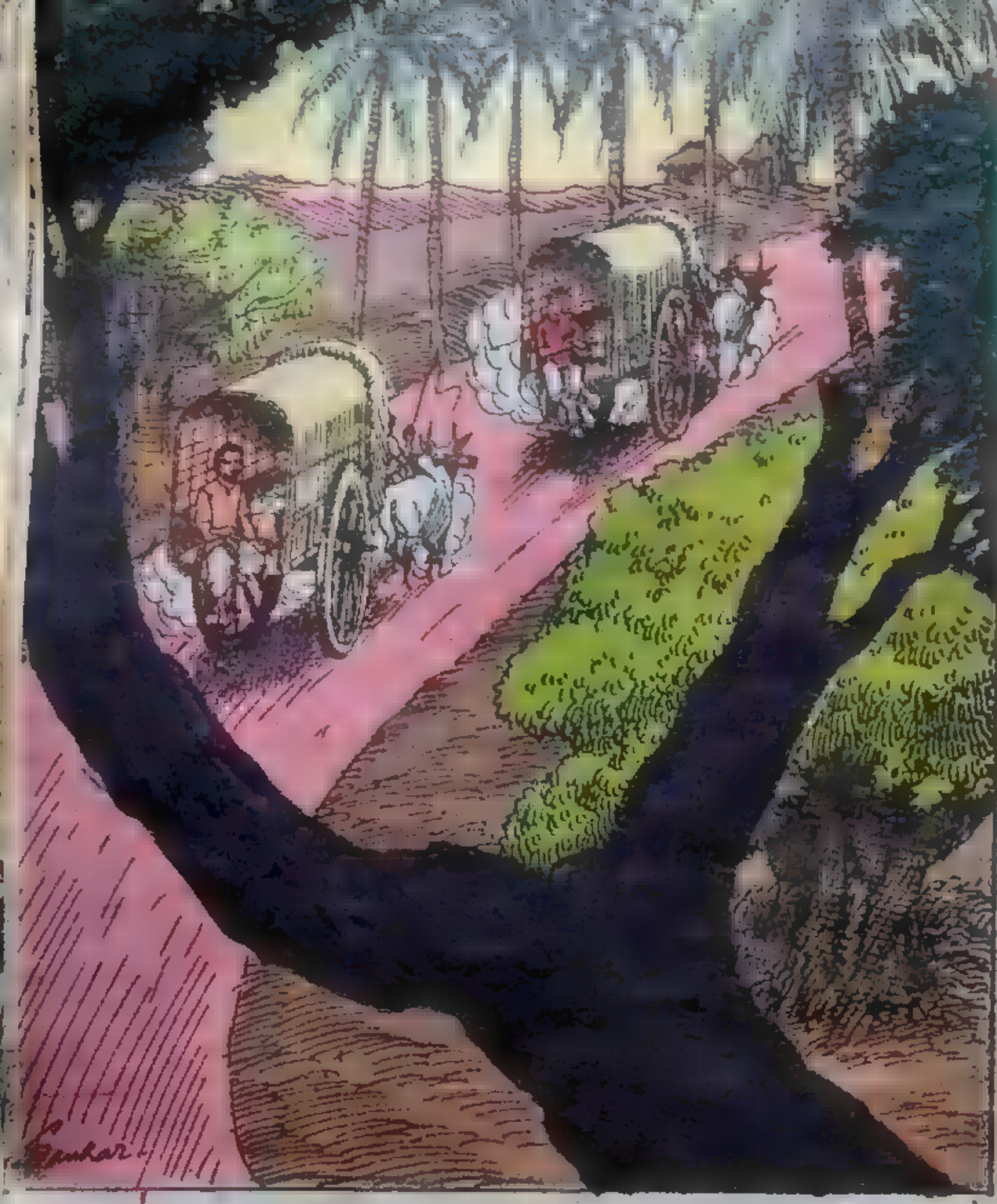
ভূপেন্দ্রের ধারণা হল নিশ্চয় অমরেন্দ্র এক মহাকঞ্জুষ। অর্থোপার্জনই তার একমাত্র লক্ষ্য। কারো জন্য একটি তুলির টানও বিনা অর্থে করে না।

অমরেন্দ্র ভূপেন্দ্রের খুব আদরযত্ন করে। ভূপেন্দ্র সেখানে একদিন থাকে। কিন্তু তার অনুভব হল, সে যেন স্বর্গে রয়েছে। একদিন পরে দুজনে রাজধানী অভিমুখে রওনা দেয়। দুজনেই তাদের সৃষ্ট মূর্তি নিয়ে ভিন্ন গাড়ীতে চলেছে। দুজনেই খুব সবধানে খড়-ঘাস-পাতা-কাপড় দিয়ে মুড়ে নিয়েছে।

রাজধানীতে এসে দুজনেই রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজনিজ শিল্প তাকে দেয়। রাজা পরের দিন তাদের আসবার জন্য বলে।

রাজবাড়ীর অতিথিশালায় দুজন রয়েছে। পরের দিন রাজার সাথে সাক্ষাৎ করে। রাজা দুজনের দিকে অবাকবিস্ময়ে তাকিয়ে বলেন, "তোমাদের দুজনের শিল্পই অদ্ভুত। মানুষের দ্বারা এই ভাস্কর্য-শিল্প অসাধ্য। কিন্তু আশ্চর্য, তোমাদের দুজনের শিল্পই এক। নৃত্যমন্দিরের দুই স্থানে এই দুই মূর্তি স্থাপনা করব। এখন কোন্‌টি কার নির্ণয় করা অসম্ভব। তোমরাই পারবে বলতে।"

দুজন শিল্পী মূর্তির দিকে এগিয়ে যায়। মূর্তি দেখে তারা অবাক। দুটোই সম্পূর্ণভাবে এক। সামান্যতম অমিল কোথাও নেই। কোন্‌টা যে কার তা তারা নিজেরাও বলতে পারল না।

"তোমরা দুজনেই সমান প্রতিভাশালী শিল্পী। দুজনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সৃষ্ট শিল্পের এরকম সাদৃশ্য খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।" রাজা তাদের বলেন।

রাজার আমন্ত্রণে শিল্পাচার্য শিলানন্দও সেখানে এসেছেন। প্রধান উদ্দেশ্য, শিষ্যদের শিল্পপ্রতিভা দেখা। শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

আচার্য রাজার অনুরোধ শুনলেন মূর্তিদুটো সম্বন্ধে। সম্মান পাওয়ার অধিকতর যোগ্য কে, তা যেন আচার্য বিচার করে দেন। আচার্য জানালেন, "সম্মান পাওয়ার যোগ্য অমরেন্দ্র। ভূপেন্দ্র তার পরে। দুজনেই আমার শিষ্য, আমার বিচারকে তারা অস্বীকার করবে না।"

"আপনার শিষ্যরা আপনাকে নিশ্চয় স্বীকার করবে, কিন্তু কোন্ যুক্তিতে অমরেন্দ্র প্রথম, সেটা জানা দরকার।" রাজা বলেন।

আচার্য বললেন, "মহারাজ ভূপেন্দ্রও সমান প্রতিভাবান। কিন্তু তার বিচারশক্তির অভাব। এরজন্যই সে তার আপন বিদ্যা অযোগ্যকে দান করেছে। যোগ্য-অযোগ্য বিচার না করে যে যেরকম মূর্তি বলেছে তাই করে দিয়েছে। এরকম করার ফলে সে শিল্পকলার প্রতি অন্যায় করেছে। তার শিষ্যরা এই শিল্পবিষয়ের প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত নয়। জ্ঞান-পিপাসা তাদের মধ্যে নেই। শিল্পের প্রতি তাদের আকর্ষণ খুবই সামান্য। এইজন্যই নাট্যশালা নির্মাণকার্যে তার শিষ্যরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। শিল্পের প্রকৃত মূল্য বুঝে যে শিল্পী প্রশংসা করে, সেই শিল্পীই সম্মান পাবার জন্য যোগ্য। প্রশংসা পাবার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে ভূপেন্দ্রের মধ্যে। সে তার শিল্পজ্ঞান অসময়ে অযোগ্যদের দান করেছে। কিন্তু যোগ্য অযোগ্য নির্বাচন করার জন্যই অমরেন্দ্র অর্থ গ্রহণ করে। এই কারণে সেই সম্মান পাওয়ার ব্যাপারে প্রথম এবং যোগ্য। সে প্রতিভাবান, শিল্পকলার প্রতিও তার স্বাভাবিক জ্ঞান রয়েছে।"

শিলানন্দের অভিমত মত রাজা অমরেন্দ্রকে সম্মান দেন। ভূপেন্দ্র তাতে বিন্দুমাত্রও দুঃখবোধ করেনি, ব্যথিত হয়নি। বরং জানতে পারে সে, কোন্ বিষয়ে তার পার্থক্য রয়েছে, নিজের কি দোষ, বন্ধুরও কি দোষ এবং কি তার বৈশিষ্ট্য। এরপর থেকে সে তার আপন পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা ভাবে, পরিবর্তন করে এবং ভবিষ্যতে একজন মহান শিল্পীরূপে পরিচিত হয়।

রাজপুত্রের তাড়া

অত্যন্ত জরুরী [illegible] যেতে হবে। বেরিয়েই বাসটাকে চলে যেতে দেখলে পরিবর্তে ট্যাক্সি করে যেতেই হবে। সেরকম, দুরপাল্লার ট্রেনে এখনই রওনা দিতে হবে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছবার জন্য, কিন্তু ট্রেনটা পাওয়া গেল না। প্রয়োজনানুযায়ী পাড়ি দিতে হয় প্লেন বা উড়োজাহাজে। এক্ষেত্রেও যদি প্লেন ধরতে না পারা যায়, তাহলে? এরকমই পরিস্থিতিতে পড়তে হয় সৌদি আরবের একজন শাহজাদাকে। প্লেন ধরার জন্য এয়ারপোর্টে আসতে গিয়ে দারুণ যানজটে আটকে যাওয়ায় দেরী হয়ে যায়। নিউ ইয়র্ক যাবার প্লেনটি নির্দিষ্ট সময়ে ছেড়ে যায়। শাহজাদা পৌঁছে শোনে, পরবর্তী নিউ ইয়র্কের প্লেন দুই-আড়াই ঘণ্টা পর। কিন্তু অত সময় অপেক্ষা করার কোন ইচ্ছা নেই। ২,৩৬,০০০ ডলার খরচ করে একটি প্লেন সম্পূর্ণ ভাড়া নিয়ে তিনঘণ্টার মধ্যে নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছয়। হয়তো তার তাড়া ছিল খুবই।

আবার তাড়া না থাকলেও নেহাত বেপরোয়া হয়ে ব্রিটেনের এক সৈনিককে প্লেনে করে যাতায়াতে মোট ৩০,০০০ কিমি. পথ পার হয়ে বাড়ীতে গিয়ে ফেলে-আসা বাড়তি চশমাটি নিয়ে আসতে হয়। আটলান্টিক মহাসাগরের 'ফকল্যাণ্ড' দ্বীপপুঞ্জে তখন সে নিযুক্ত। ফুটবল খেলার সময়ে চশমাটি ভেঙে যায়। অথচ দিনের বেশির ভাগ কাজের সময়ে তাঁকে কম্পিউটারের পর্দার সামনে বসে [illegible] করতে হয় যা [illegible] চশমায় সম্ভব [illegible]। দুর্ভাগ্য, কোন চক্ষু-চিকিৎসক সেখানে নেই। উপায়হীন হয়ে সে 'রয়্যাল এয়ার ফোর্স'-এর প্লেনে করে বাড়ীতে আসে চশমাটি নিয়ে যাওয়ার জন্য। এ ভিন্ন অন্য কোন পথ ছিল না।

SOS

●●● — — — ●●●

RIP

●—● ●● ●— —●
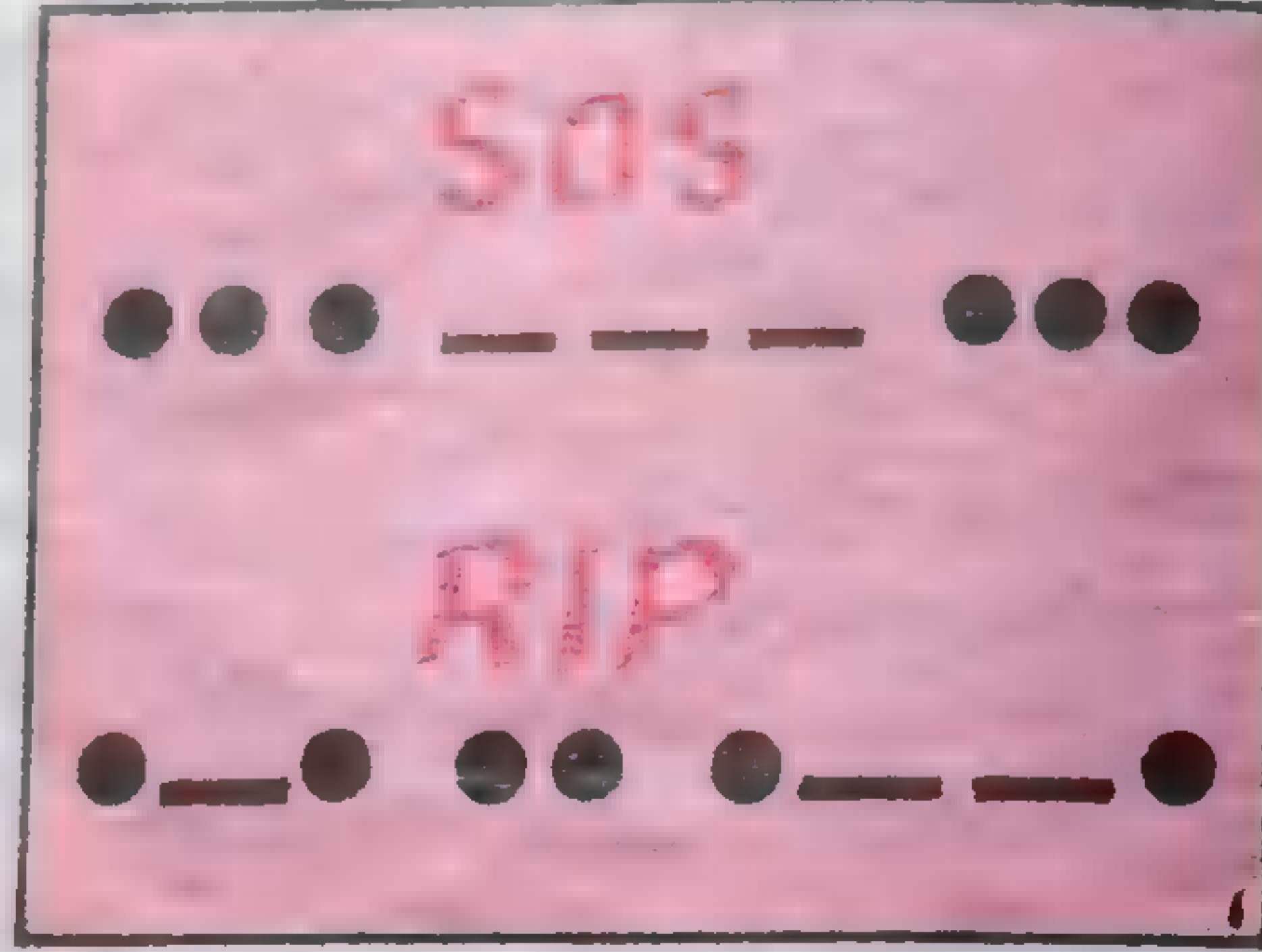
বিভীষিকার মধ্যে

সমুদ্রযাত্রার সময়ে বিভিন্ন জাহাজের মধ্যে খবর আদানপ্রদানের জন্য বিন্দু এবং ড্যাশের ব্যবহার ছিল। এগুলো 'মোর্স কোড' নামেই পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ, তিনটি বিন্দুর পরে তিনটি ড্যাশ আবার তিনটি বিন্দু—এস.ও.এস.-এর সঙ্কেত-চিহ্ন হিসাবেই ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ, 'সেভ আওয়ার সোল' বা 'আমাদের জীবন বাঁচান'। বিংশ শতাব্দীতেই এর সূচনা হয়। কিন্তু বর্তমানে টেলিফোন, কম্পিউটার এবং উপগ্রহ মারফত বিভিন্ন জাহাজের মধ্যে খবর আদানপ্রদান সহজতর হয়ে ওঠায় এই 'মোর্স কোড' এখন বিলুপ্তির পথে।

হনুমানের কথা

একদিন রাম অযোধ্যায় মন্ত্রী এবং সামন্তদের সাথে রাজসভাগৃহে আলোচনা করছেন, সেসময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র দ্রুতবেগে সভাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বললেন, "রাম কাশীর রাজা যযাতি অহঙ্কার ও গর্বে অন্ধ হয়ে আমাকে অপমানিত করেছে। এই অধম রাজাকে তুমি বিনাশ কর এখনই। গুরুরূপে তোমাদের প্রতি আমার এই আজ্ঞা।" আদেশ দান করে তখনই তিনি চলে যান।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আজ্ঞা শুনে রাম হতবাক হয়ে যান। অন্য অন্য রাজাদের মত যযাতিও একজন যে রামের প্রতি সর্বদা বিনয় প্রকাশ করে, তাঁর প্রতি অনুরক্ত। কাশী রাজ্যের প্রতিপালনও সে খুব ভালভাবেই করে। বাল্যকালে বিশ্বামিত্র একবার তাঁর যজ্ঞাদি-অনুষ্ঠানকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রাম ও লক্ষ্মণকে নিজের সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেসময়ে রামকে তিনি কত দিব্যাস্ত্র উপহার দিয়েছেন। অতি-মানবীয় বহু শিক্ষাও রামকে দান করেন। এখন রাম গভীর ভাবনার মধ্যে পড়ে যান, 'এখন প্রজাগণ যাকে আন্তরিকভাবে চায়, যে আমার প্রতি অপার ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করে, সেই যযাতিকে কিভাবে বধ করব। গুরুদেব বিশ্বামিত্রের আজ্ঞাও তো অমান্য করার উপায় নেই।'

রাজসভা ত্যাগ করে রাম একান্ত গোপন মন্ত্রণাকক্ষে এসে মন্ত্রী সুমন্ত্রকে ডেকে বললেন, "সুমন্ত্র, এ আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয় বলেই বোধ হচ্ছে। একাকী গিয়ে যযাতিকে আমায় বধ করতে হবে।
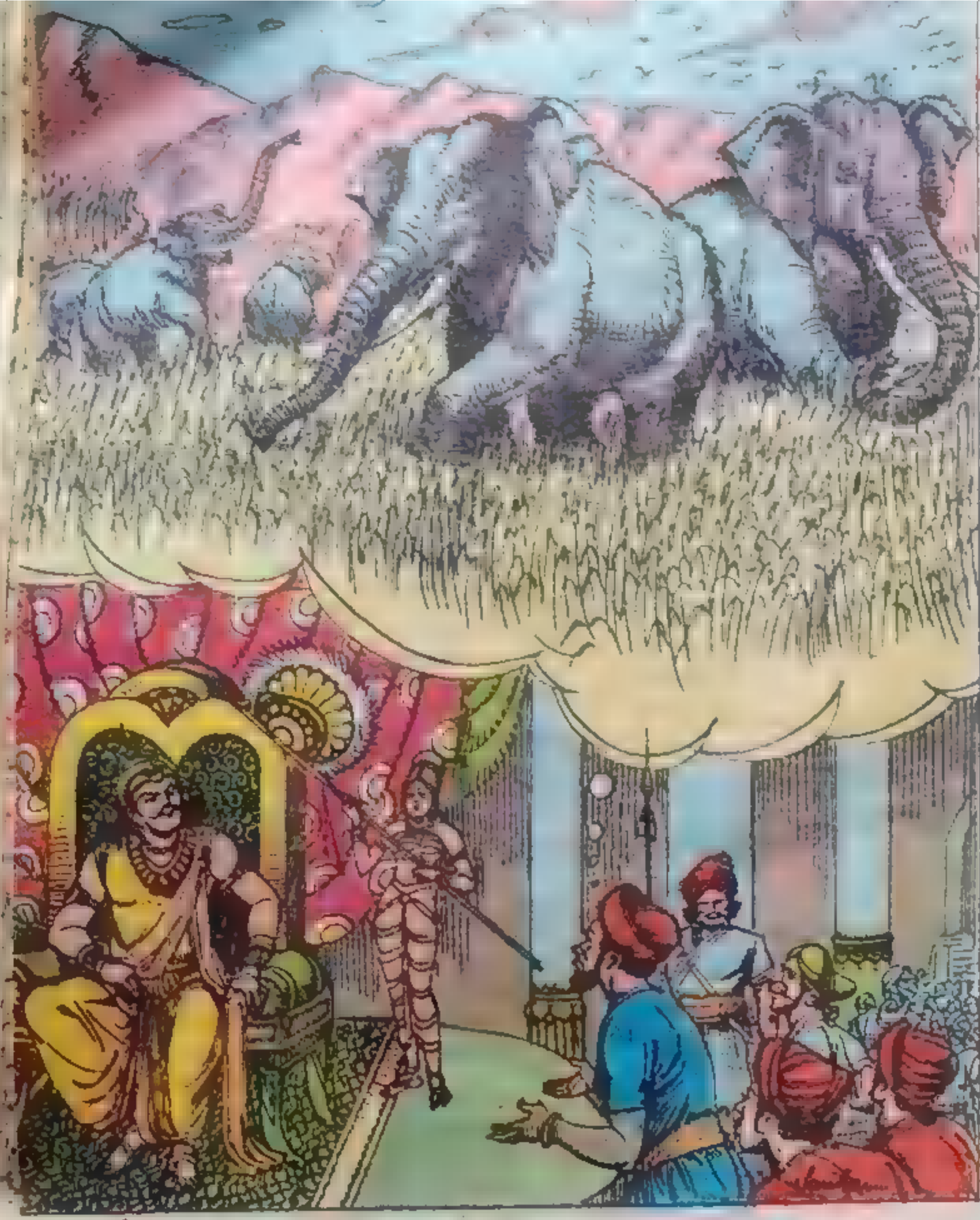
আমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করব। এই যুদ্ধ আমাদের দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যুদ্ধে *কোন* প্রকারেই প্রজাদের কোন ক্ষতি হতে দেওয়া যাবে না। যযাতিকে এখনই খবর পাঠাও, 'রাম তোমাকে বধ করবার জন্য আসছে'।" রামের কথায় দৃঢ়তা, স্থিরতার প্রকাশ পায়।

বিশ্বামিত্র এবং যযাতির মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির কারণ: যযাতির কাছে পীড়িত গ্রামবাসীরা এসে নিবেদন করে যে জঙ্গলের হাতির পাল এবং অন্য জন্তু গ্রামে এসে আক্রমণ করে গ্রামবাসীদের হত্যা করছে, অনেক ক্ষতি করছে তাদের। রাজা যযাতি তাদের মিনতি শুনে তাদেরকে রক্ষার জন্য তখনই বেরিয়ে পড়ে। ওই সময়ে বিশ্বামিত্রও ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রজারক্ষার চিন্তায় মগ্ন যযাতি রথে বসে, বিশ্বামিত্রকে দেখেনি। শিকার করবার জন্যই দ্রুতবেগে রথ চালনা করে চলে যায়।

বিশ্বামিত্রের ধারণা, যযাতি জেনেশুনে তাঁর প্রতি এরকম ঘোর অপমান করল। তিনি নিজেই বলতে থাকেন, "আমাকে দেখেও যযাতি রথ থেকে নেমে এল না, ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় আমার সামনে মাথা নত করল না। এরকম না করে সে আমায় ঘোর অপমান করল। এই অধম যযাতির নাশ যদি আমি করতে না পারি তবে আমি বিশ্বামিত্র নই।" এরকম প্রতিজ্ঞা করে তিনি সোজা রামের কাছে এসে ওই আজ্ঞা দেন। ক্ষণিকমাত্রও অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ ফিরে যান সভাগৃহ হতে।

যযাতির শাসনকালে প্রজাদের কখনও কোন কষ্ট হয়নি। তাদের সমস্ত প্রয়োজন সে তৎক্ষণাৎ পূরণ করে। তাদের প্রতি সর্বদা তার সন্তানের স্নেহ। এরকম রাজার প্রতি বিশ্বামিত্রের এরকম আজ্ঞা রামের বড় বিচিত্র লাগে। একটুও সময় তিনি দেননি যে জিজ্ঞাসা করে জানা যাবে।

কিন্তু গুরুদেব বিশ্বামিত্রের আদেশ অমান্য করতেও রাম পারেন না। কারণ তিনি তাঁর গুরু। বাল্যকাল হতে অস্ত্রশস্ত্রের শিক্ষা রাম তাঁর কাছেই লাভ করেছেন।

রামের দূতের মুখে খবর শুনে যযাতি ভয়ে কেঁপে ওঠে। যযাতির পত্নী যশোধরা। চন্দ্রাঙ্গ নামে সুন্দর এক পুত্রসন্তান, চন্দ্রমুখী তার কন্যা। পরিবারের সকলে রামের আরাধনা করে। এই খবর পৌঁছলে সকলে দুঃখশোকে ডুবে যায়।

কিছু পরে নিজেকে সংযত করে যযাতি তার পত্নীকে বলে, "'আমি নিরপরাধ, আপনার শরণাগত, আপনার কৃপাতেই প্রাণধারণ করে রয়েছি'—এই নিবেদন আমি রামের কাছে করব। তুমি জান, রাম করুণাময়। তিনি কখনও কোন অন্যায় করেন না। অনাবশ্যকভাবে কারোর কোন ক্ষতি করেন না। ঋষি বিশ্বামিত্রের মিথ্যা অভিমানের মিথ্যা প্রতিজ্ঞার তিনি নিশ্চয়ই বিরোধিতা করবেন, কারণ আমি নির্দোষ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, স্বয়ং রামই আমাকে এই সঙ্কট হতে রক্ষা করবেন।"

রাজা যযাতি সপরিবারে অযোধ্যা যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ে। পথিমধ্যে নারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। যযাতির কাছ থেকে বিস্তারিত জ্ঞাত হয়ে নারদ জোরে হেসে দিয়ে বললেন, "বোধ হচ্ছে, এই বিপত্তির সময়ে তুমি সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিহীন হয়ে পড়েছ। জান নিশ্চয়ই, 'এক কথা, এক বাণ'-এর জন্য রাম প্রসিদ্ধ। তোমাকে দেখামাত্র সে তোমায় বধ করবে। এখন বিচার-বিবেচনা করার সময় নেই। এখনই অঞ্জনাদেবীর আশ্রমে যাও। তার অভয়বর লাভ কর। জান নিশ্চয়ই, হনুমান তার পুত্র। হনুমান কিছুদিন যাবৎ সেখানেই বাস করছে।"

নারদের কথা যযাতির অতি সত্য বলে বোধ হয়। তখনই সে একাকী অঞ্জনাদেবীর আশ্রমের দিকে যাত্রা করে।

আশ্রমে অঞ্জনাদেবী পূজা সমাপন করে যখন উঠতে যাবে, সেসময়ে আর্তনাদ শুনতে পায়, "আমি শরণাগত, আমায় রক্ষা করুন। আমি প্রাণভিক্ষা চাইছি।" আর্তনাদ শুনে বাইরে এসে অঞ্জনাদেবী দেখে,
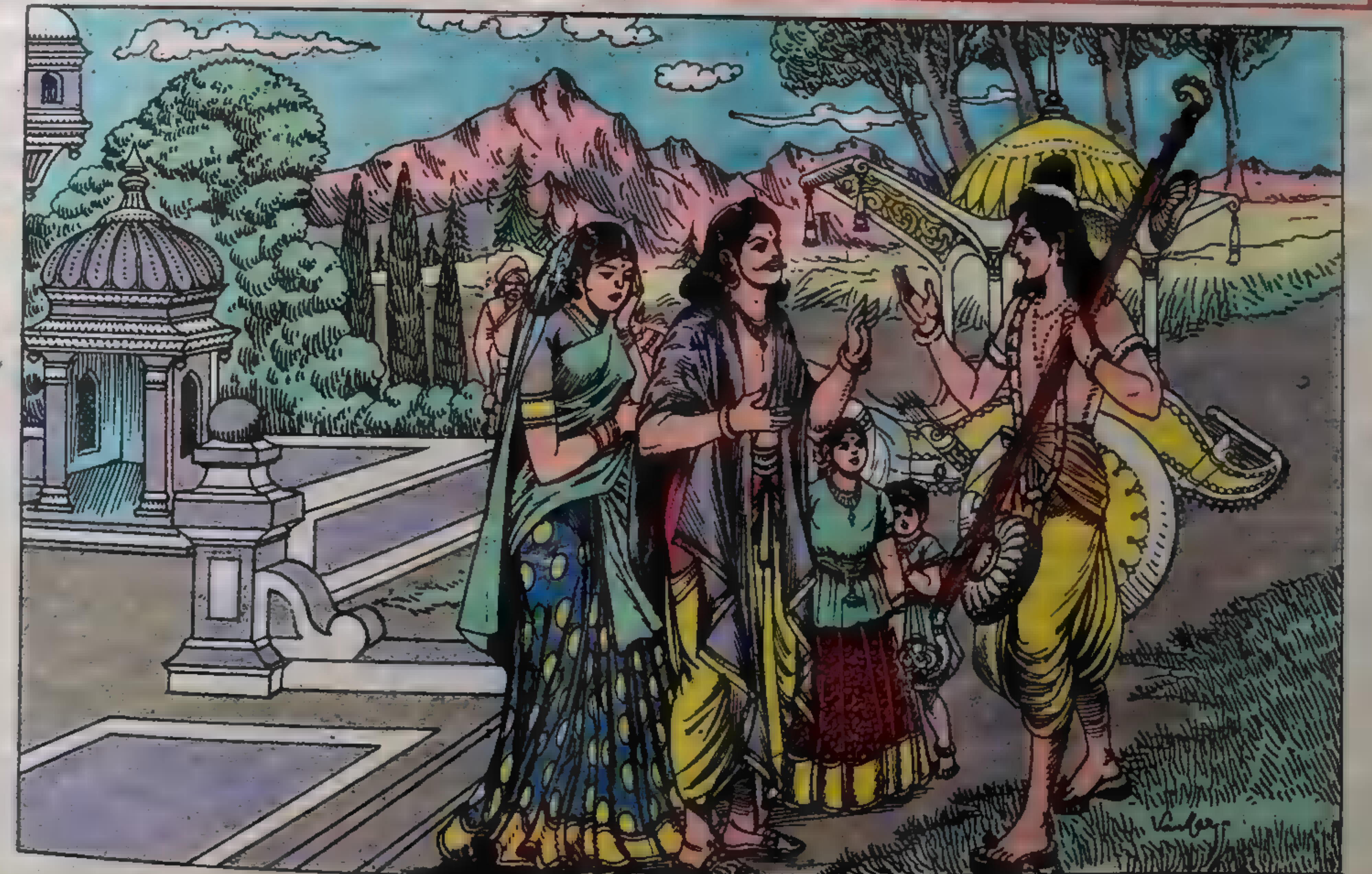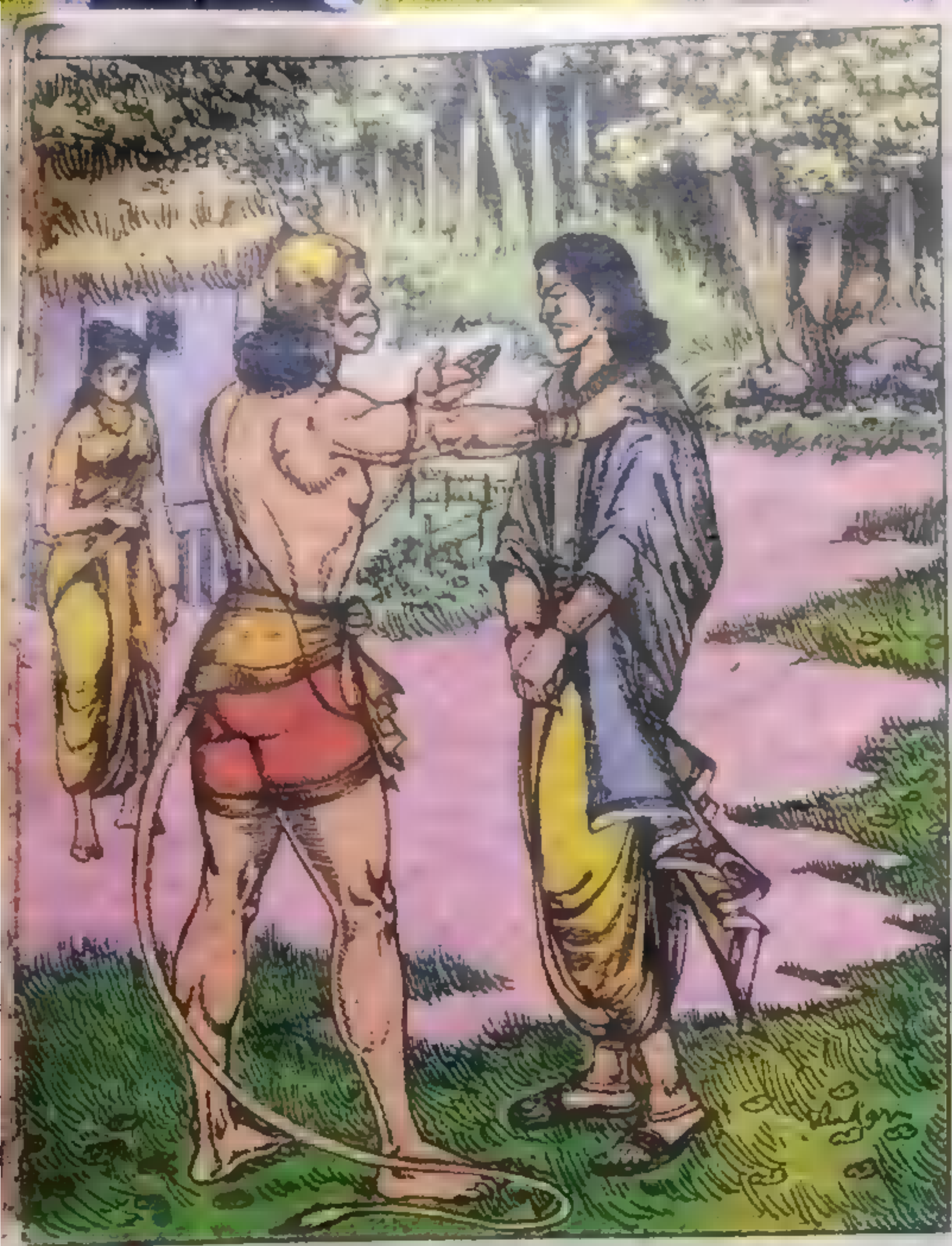
হাতজোড় করে যযাতি দাঁড়িয়ে, প্রাণের ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

"পুত্র, ভয় ত্যাগ কর। আমি আমার পুত্রের নামে বলছি, তোমার উপর কোন বিপদ আসতে আমি দেব না।" এই বলে অঞ্জনাদেবী যযাতিকে অভয়দান করে। সেই মুহূর্তে হনুমান গন্ধমাদন পর্বত হতে ফিরে এসেছে। মা এবং পুত্রকে প্রণাম জানিয়ে যযাতি জানাল, "আমার নাম যযাতি। কাশীর রাজা আমি। আমার অন্তর শ্রীরামের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। আপনারাই আমায় কেবল রক্ষা করতে পারেন।" ভীত কম্পিতস্বরে সে তার কথা বলল।

হনুমান যযাতির পিঠ চাপড়ে বলল, "রাজন, এখনই আমার মা তোমায় অভয়দান করল। তবুও কেন তুমি ভীত? আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, আমার মায়ের সত্য রক্ষা যেভাবে পূর্ণ হয় সেরকম করব।"

যযাতি তবুও করুণস্বরে জানায়, "হে আঞ্জনেয়, আমি কি বলতে পারি? বিনা অপরাধে শ্রীরাম আমাকে বধ করতে চাইছেন।" সবিস্তারে হনুমানকে জানাল যা যা ঘটেছে।

হনুমান মৌন হয়ে সমস্ত শোনে।

"কি বিরাট একটা ভুল হয়ে গেছে। না জেনে আমি তোমাকে অভয় দিয়েছি। আমার অপরাধ হয়ে গেছে।" ব্যাকুল হয়ে অঞ্জনা বলল।

হনুমান তখন তার মাকে বলে, "মা চিন্তিত হবার কোন আবশ্যকতা নেই। দুঃখী শরণার্থীকে রক্ষা করার চেয়ে মহত্তর আর কোন ধর্ম নেই। আমি যতক্ষণ জীবিত থাকব, ততক্ষণ যযাতির কোনরূপ ক্ষতি হতে দেব না।"

যযাতিকে হনুমান অভয় দান করেছে, একথা অতি সত্বর রাষ্ট্র হয়ে অযোধ্যাতেও পৌঁছে যায়। রামও শুনেছেন। অন্তঃপুরে সীতাও জানতে পেরেছে।

অন্তঃপুর হতে সীতা যখন বাইরে আসছিল, সেসময়ে যশোধরাকে দেখতে পায়। সাথে তাদের দুই পুত্রকন্যা। যশোধরা সীতার সম্মুখে এসে কেঁদে ওঠে, "মা জানকী, আমার পতির জীবন আপনি রক্ষা করুন।"

"দেবী, আমি জানতে পেরেছি, তোমার পতি এখন হনুমানের আশ্রয়ে নিরাপদে আছেন। বিশ্বাস কর, এখন আর তাঁর কোন ভয় নেই। তুমি ও তোমার সন্তানেরা এখন

আমার কাছে এখানেই থাক।" সীতা তাকে আশ্বস্ত করে তাদের থাকবার ব্যবস্থাদি করে দেয়। দুই নাবালক শিশু সন্তান সীতার খুব প্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের দেখে সীতারও সন্তানলাভের ইচ্ছা জাগে। সে ভাবে, এরকম সন্তান তারও হলে কত ভাল হয়।

যযাতিকে বধ করার জন্য রাম তীর-ধনুক নিয়ে পদব্রজে চলেছেন। তাঁর পিছনে অনুসরণ করে আসছে তিনভাই এবং মন্ত্রী। রামের তীর-ধনুক ভিন্ন আর কারো কাছে কোন অস্ত্র নেই। রাম অঞ্জনার আশ্রমে এলে হনুমান শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানায়। পুষ্প-চন্দন দিয়ে রামের পাদপূজা করে।

তারপর হনুমান রামের চরণস্পর্শ করে প্রার্থনা করে, "হে রাম, এই যযাতির উপর দয়া করুন। সে সম্পূর্ণভাবে নিরপরাধী। বলহীনকে দণ্ড দেওয়া আপনার মত মহান ব্যক্তির নিকট মোটেই শোভনীয় নয়। আমি তার জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।"

ক্রোধ প্রকাশ করে রাম বললেন, "আমাকে অনুনয় করার তোমার এতবড় স্পর্ধা?" বলে রাম হনুমানকে ধাক্কা দেয়। রামের স্পর্শে হনুমান অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলে, "যে চরণের স্পর্শে পাথরও শাপমুক্ত হয়ে অহল্যাতে পরিবর্তিত হয়, পবিত্র হয়, সেই পাদস্পর্শে আজ আমি ধন্য হলাম। এই স্পর্শ আমার দেহে অদ্ভুত শক্তি প্রদান করল।"

আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন রাম, "আরে বানর, মিছামিছি এসমস্ত প্রশংসা ত্যাগ করে যযাতিকে আমার হাতে সঁপে দাও। শোন, গুরুর আজ্ঞা পালনের জন্যই আমি এখানে এসেছি।"

"হে শ্রীরাম, আপনি জানবার প্রয়াস পর্যন্ত করেননি যে আপনার গুরুর আজ্ঞা কত অসঙ্গত এবং ন্যায়হীন। সত্য কারণ বিচার না করে আপনি তাকে বধ করার জন্য এখানে এসেছেন। আমার মায়ের সত্যরক্ষার জন্য আমি যযাতিকে অভয় দান করেছি। প্রথমে আপনি আমায় বধ করে তারপর আপনি আপনার উদ্দেশ্য সফল করুন।" বলে হনুমান উঠে দাঁড়ায় গম্ভীর মুখে। অকস্মাৎ হনুমানের দেহ ক্রমশ আয়তনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার প্রকাশও ব্যাপ্তি লাভ করতে থাকে।

এই দেখে রাম তাকে বলেন, "আচ্ছা, তুমি তাহলে এত বড় হয়ে গেছ। আমি তো
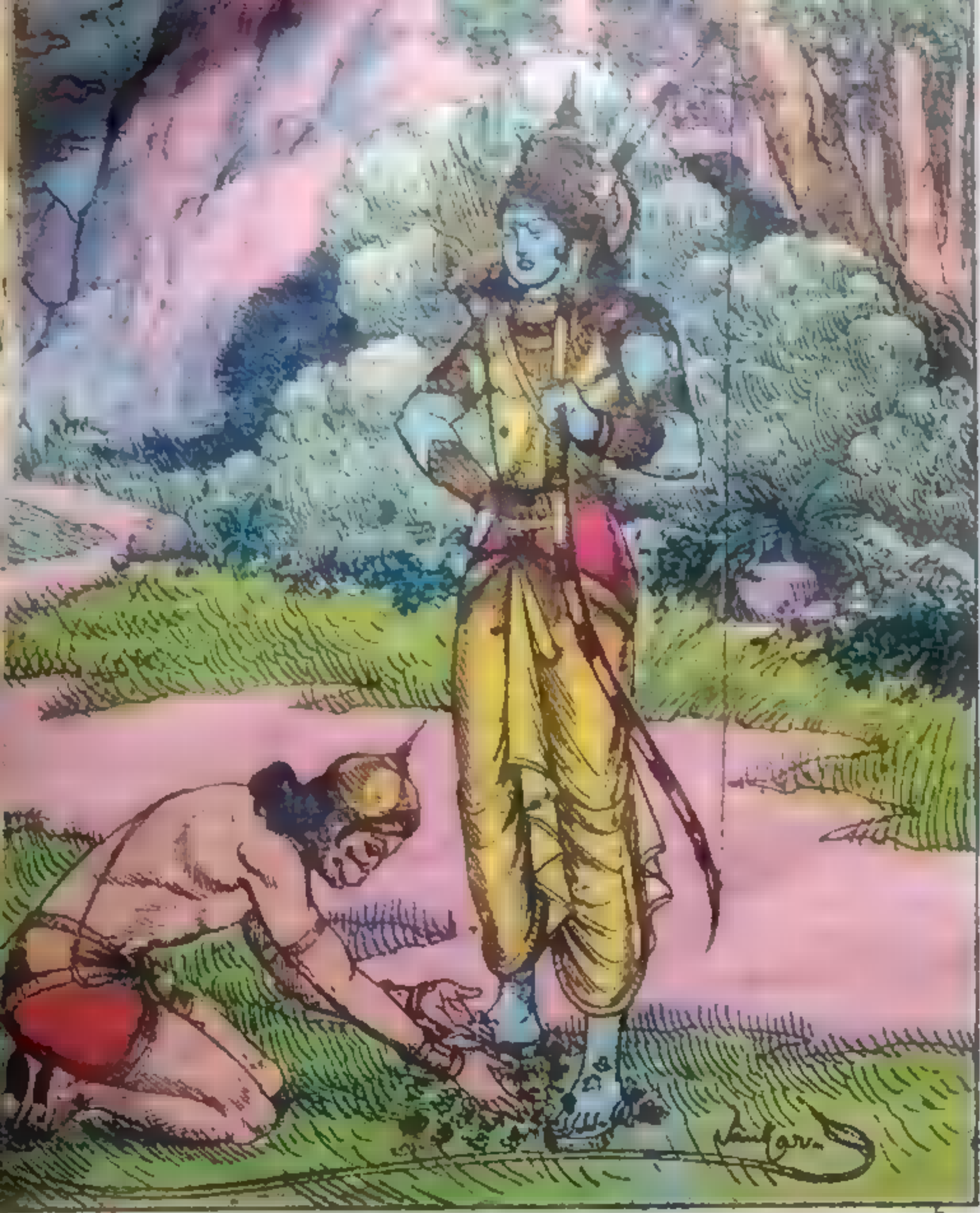
কেবল তোমাকে একটা বানর বলেই জানি। আমি ভাবতেও পারিনি, আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা ও সাহস তোমার মধ্যে রয়েছে।"

"হে শ্রীরাম, আমি তো এখনই নিবেদন করলাম যে আপনার চরণস্পর্শদানের মহিমাতেই আমার এই পরিণতি।" হনুমান সঙ্গে সঙ্গে বলে।

রাম ধনুকে তীর সংযোজন করে হনুমানের দিকে নিশানা করেন। হনুমান তা দেখে তার পুচ্ছ প্রসারিত করে চক্রাকারে ঘোরাতে থাকে। রাম যে অস্ত্রই হনুমানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন হনুমান সেটাই লেজ দিয়ে ধরে ছুঁড়ে দেয়।

ওই সময়ে বিশ্বামিত্রও দৌড়তে দৌড়তে সেখানে আসেন।

রাম যতই অস্ত্র নিক্ষেপ করেন হনুমানের দেহ ততই বড় হয়। বিরাট দেহ তার। রামকে আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে অস্ত্র ত্যাগ করতে হচ্ছে হনুমানের উদ্দেশ্যে। হনুমান বীরের ন্যায় বলে, "হে রাম, এখন আপনার লক্ষ্যবস্তু নিকটে এসেছে না?"

রামের রাগ যায় না। বলে ওঠেন তিনি, "এবার আমি শেষবারের মত তোমার বক্ষ লক্ষ্য করে রামবাণ নিক্ষেপ করছি। এতে তোমার এবং আমার দুজনেরই কার্য সমাপ্ত হবে।" বলে তিনি অর্ধচন্দ্রাকার বাণ তূণ হতে বের করেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র দৌড়তে দৌড়তে এসে বললেন, "রাম, অস্ত্রনিক্ষেপ বন্ধ কর। আমার ইচ্ছা, তুমি হনুমানের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হও। এসমস্ত দেখে আমার অহঙ্কার দূর হয়েছে। আমি জ্ঞাত হয়েছি যে এর মধ্যে যযাতির কোন দোষ নেই। সে নিরপরাধ।"

অসম্মতির ভাব প্রকাশ করে রাম মাথা হেলিয়ে উত্তর দিলেন, "না গুরুদেব, আমার অস্ত্র সংযোজন হয়ে গেছে। এই সময়ে আপনার আজ্ঞা কি করে পালন করা সম্ভব। কৃপা করে আমায় থামতে বলবেন না।"

রাম ধনুকের ছিলায় টঙ্কার দিয়ে তার অস্ত্রকে হনুমানের প্রতি লক্ষ্য করে তারপর বললেন, "হনুমান, এবার আমার রামবাণ তোমার বক্ষ লক্ষ্য করেছে। এখনও বলছি, তোমার অহঙ্কার দূর কর। যযাতিকে আমার হাতে সঁপে দাও এবং বল, তুমি রামের সেবক।"

হনুমান তখন রামকে বলে, "তখন এবং এখন, সর্বদাই আমি শ্রীরামের বিশ্বাসযোগ্য
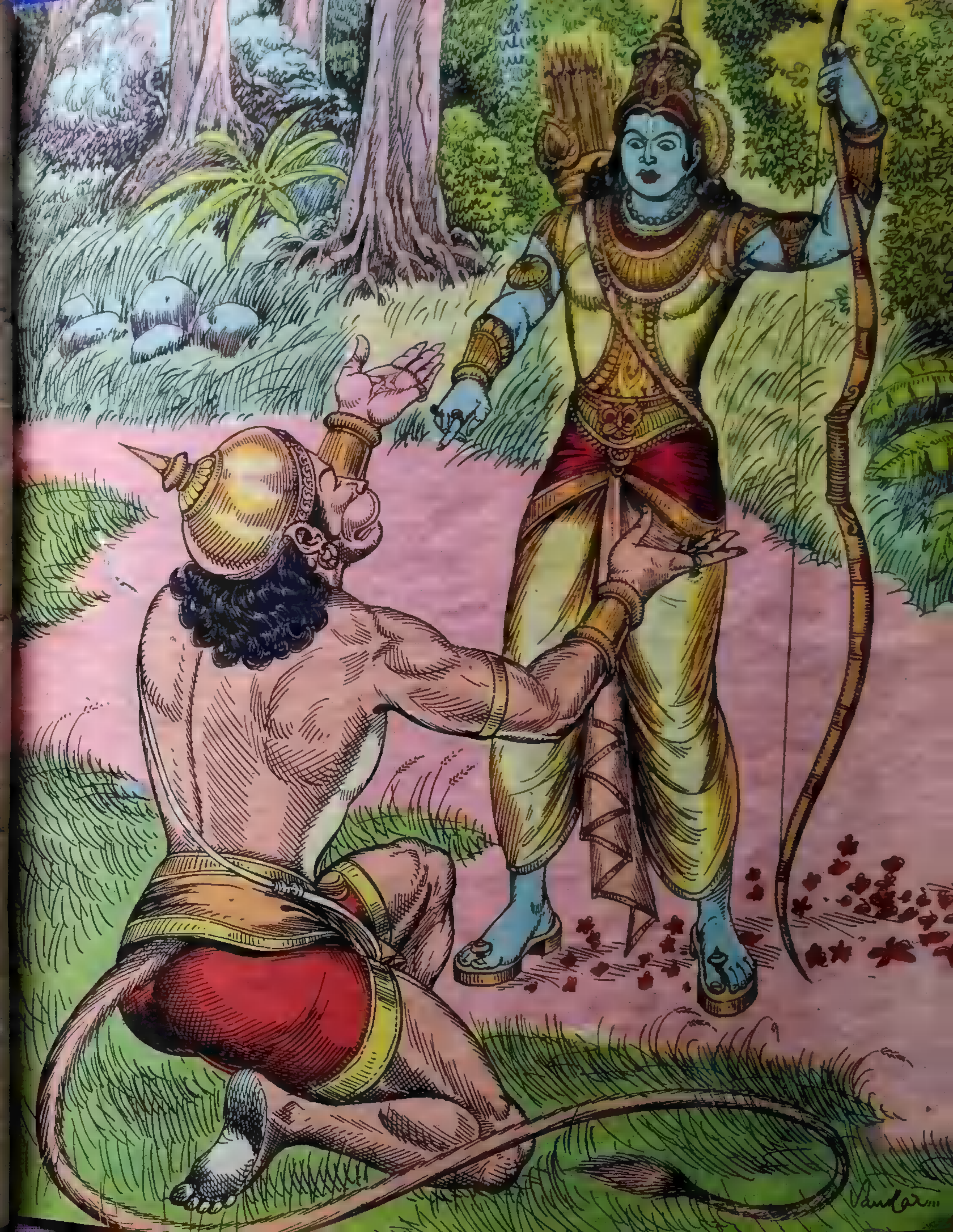
সেবক। নিজের কথার সত্যতা যে রক্ষা করতে পারে না সে কখনই আপনার সেবক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এরকম হলে আপনারই অপমান হবে। আপনি আপনার রামবাণ নিক্ষেপ করুন। অন্তর দিয়ে আপনার বাণকে আমি গ্রহণ করব।" বলে হনুমান দুহাতে তার বুক চিড়ে ওই রামবাণের একেবারে সামনে রাখে। ওই বাণ হনুমানের হৃদয় বিদীর্ণ করে বিপরীত দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। হনুমানের বুকের অভ্যন্তরে রামের রূপকে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এই অপূর্ব ঘটনায় ওখানে উপস্থিত সবাই নির্বাক হয়ে তা দেখে।

রাম তাঁর তীর-ধনুক মাটিতে নামিয়ে রেখে বলেন, "হনুমান তুমি অপরাজেয়। আমিই তোমার কাছে পরাজিত হলাম।"

যে হাতে হনুমান তার বুক চেপে ধরেছিল, সেটা ছাড়তেই সমস্ত মিলিয়ে যায়, পূর্বের ন্যায় অক্ষত হয়ে যায়।

"হে রাম, এক্ষেত্রে জয় পরাজয়ের কোন প্রশ্নই আসে না। আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বাণ আপনাকেই বিদ্ধ করেছে, আপনিই একে গ্রহণ করেছেন। ওই মারণাস্ত্র আমাতে নয়, আপনার মধ্যেই লীন হয়ে গেছে। এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, আপনিই আমাকে রক্ষা করেছেন।" হনুমান রামের পদপ্রান্তে মাথা নত করে জানায়।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র এগিয়ে এসে হনুমানকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বললেন, "হনুমান, শরণাগতকে রক্ষা করা পরম কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনে তুমি স্বয়ং রামেরও বিরোধিতা করেছ। তোমার শপথ তুমি রক্ষা করেছ; প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আপন প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলে। তুমিই প্রকৃত বীর। 'বীর হনুমান' নাম তোমার সার্থক। তোমার যশ প্রতিষ্ঠা ত্রিলোকে প্রচারিত হবে, চিরস্থায়ী হবে তোমার গাথা।"

হনুমান মুনিবর বিশ্বামিত্রকে প্রণাম জানায়। রামকে এবং তাঁর সঙ্গে আগত আর সকলকে প্রণাম জানিয়ে তাঁদের বিদায়ক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে। সকলে বিদায় গ্রহণ করলে হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যার জন্য যাত্রা করে।

(ক্রমশ)

গঙ্গার বরাত

গ্রামের চাষী অনন্ত। তার বোন গঙ্গা। ছোট থেকেই গঙ্গা খুব অহঙ্কারী। অনন্ত তাকে ভালবাসলেও তার ভাইয়ের প্রতি টান অত নেই। অবশ্য অনন্ত এরজন্য পরোয়া করে না। ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারিয়ে বোনকে বুকে করে বড় করেছে। তার বোন খুশিতে থাকুক সেটাই সে চায়। ভাল পাত্র দেখে দু'একর জমি যৌতুক দিয়ে বোনের বিয়ে দেয়। তারপর অনন্ত এক দরিদ্রঘরের মেয়েকে বিবাহ করে নিয়ে আসে বিনা যৌতুকে।

গঙ্গা শ্বশুরবাড়ী গেছে। এদিকে অনন্তের স্ত্রী এসে নতুন সংসার শুরু করে। স্ত্রীর সাথে অনন্ত সুন্দরভাবে মনের মিল করে দিন কাটায় সুখে দুঃখে। ক্রমে পরিবারের বোঝা তার বৃদ্ধি পেতেই থাকে। অনেকগুলি সন্তান হয় তার। শেষে এমন পরিস্থিতি আসে যেন তার 'দিন আনি দিন খাই' অবস্থা।

সন্তানরা যখন ক্ষুধায় চেঁচাতে থাকে তখন মা-বাবার বুক দুঃখে ফেটে যায়। কান্না বেরিয়ে আসে তাদের। যে শিশুদের এখন কেবল খেলাধূলা ছুটোছুটি করে কাটাবার বয়স, তাদের মড়ার মত ঝিমোতে দেখে অনন্তের পত্নী বলে, "দুঃখ যন্ত্রণা যেন আমাদের ঘিরে রেখেছে। একবার তুমি তোমার বোনের কাছে যাও। যদি কিছু দিয়ে সাহায্য করে।"

"যেতে তো পারি, কিন্তু ও নিজেও কি খুব সুখে আছে যে আমাদের সাহায্য করতে পারে। বিয়ের পর একদিনও তাদের খবরাখবর নিইনি। দাদা হলেও আমিই তার মা-বাবার মত। কিন্তু আমার কাজ আমি করেছি কি? এখন আমি কোন মুখ নিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াব। এখন গেলে খালি হাতে আমায় যেতে হবে। তাকে দেখার জন্য আমিও তো ছটফট করছি।" অনন্ত জানায়।

"তা অবশ্য ঠিক। তাকে অন্তত দেখে

(২৫ বৎসর পূর্বে 'চাঁদমামা'য় প্রকাশিত গল্প)

এস একবার। পাঁচ বৎসর বিয়ে হয়েছে! তার কুশলাদি সংবাদ নেওয়াও দরকার। যাও, খোঁজ নিয়ে এস, আর যদি আমাদের অবস্থা শুনে কিছু দেয় তো ভাল।" অনন্তের স্ত্রী পরামর্শ দেয়।

স্ত্রীর কথামত বোনের শ্বশুরবাড়ীর দিকে রওনা দেয়। সারাদিন চলার পর বিকেলে এসে পৌঁছয়। গঙ্গা দূর থেকেই দাদাকে আসতে দেখেছে। পরনের জামাকাপড় জীর্ণ, ছেঁড়া। চুল এত শুকনো রুক্ষ, মনে হয় তেল কোনদিন পড়েনি মাথায়। অনাহারে অর্ধাহারে দেহ দুর্বল, শীর্ণকায়। কোটরাবদ্ধ চোখদুটিই দেখে বোঝা যায় তার ভাই কত দীন অবস্থায় রয়েছে। তার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে গঙ্গা খুবই ভয় পেয়ে যায়। দাদার হাতও একেবারে শূন্য। বোনকে দেবার জন্য কিছুই সে আনেনি। বরং মনে হচ্ছে দাদাই তার কাছে কিছু নিতে আসছে।

দাদাকে দেখে কোথায় তার মন খারাপ হবে, কষ্ট হবে, দয়া হবে, তা নয়। বরং তার মনে ভাবনা আসে, "আমার এই সুখ-সাচ্ছন্দ্য দেখে দাদার নজর পড়ে যাবে।"

অনন্ত নিজেও বোনকে দূর থেকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখতে না পেয়ে ভাবল, বোন হয়তো তার পা ধোওয়ার জল আনতে ভিতরে গেছে।

এদিকে গঙ্গা ঠিক করে, যেভাবেই হোক যত তাড়াতাড়িই হোক, দাদাকে বিদায় করতে হবে। ভিতরে এসে ভাল শাড়ী ছেড়ে ছেঁড়া শাড়ী পরে। তারপর একটা পাত্রে জল এনে দুঃখীভাব ফুটিয়ে বাইরে আসে।

মুহূর্তে বোনের মধ্যে পরিবর্তন দেখে অনন্ত আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু নিজের মনকে বোঝায় হয়তো অন্য একজনকে দেখেছে।

দাদাকে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গঙ্গা জোর করে দুচোখ জলে ভরে বলে, "এতদিন পর আমাকে তোমার মনে পড়ে। দাদা, তুমি ভেবেছিলে এখানে তোমার বোন খুব ভাল আছে, কিন্তু আমার তো...।"

বোনের অবস্থা দেখে অনন্তের খুবই দুঃখ হয়। সমস্ত আশা তার ভেঙে যায়।

দাদাকে ঘরের ভিতরে যাবার কোন সুযোগ না দিয়ে সেখানেই একটা ভাঙা খাটিয়ায় বসতে দেয় গঙ্গা। অনন্ত খাটিয়ার উপর নিজের চাদরটা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে চিন্তা নিয়ে।

ক্ষেতের কাজ থেকে গঙ্গার স্বামীর ফিরবার সময় হয়ে আসছে। দাদাকে শুয়ে থাকতে দেখে গঙ্গা বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে দৌড়ে গিয়ে রাস্তাতেই স্বামীকে ধরে দাদার আসবার খবর জানায়। তার স্বামী অত্যন্ত খুশি, বিয়ের পর এই প্রথম তাদের বাড়ীতে এসেছে তার বড় শ্যালক।

কিন্তু গঙ্গা যখন দেখল, তার স্বামীকে আটকাতে পারবে না তখন বলল, "দাদা যদি জানতে পারে যে আমরা ধনী, তাহলে প্রায়ই এসে সাহায্য চাইবে। আমাদের যেভাবেই হোক দাদাকে বোঝাতে হবে যে
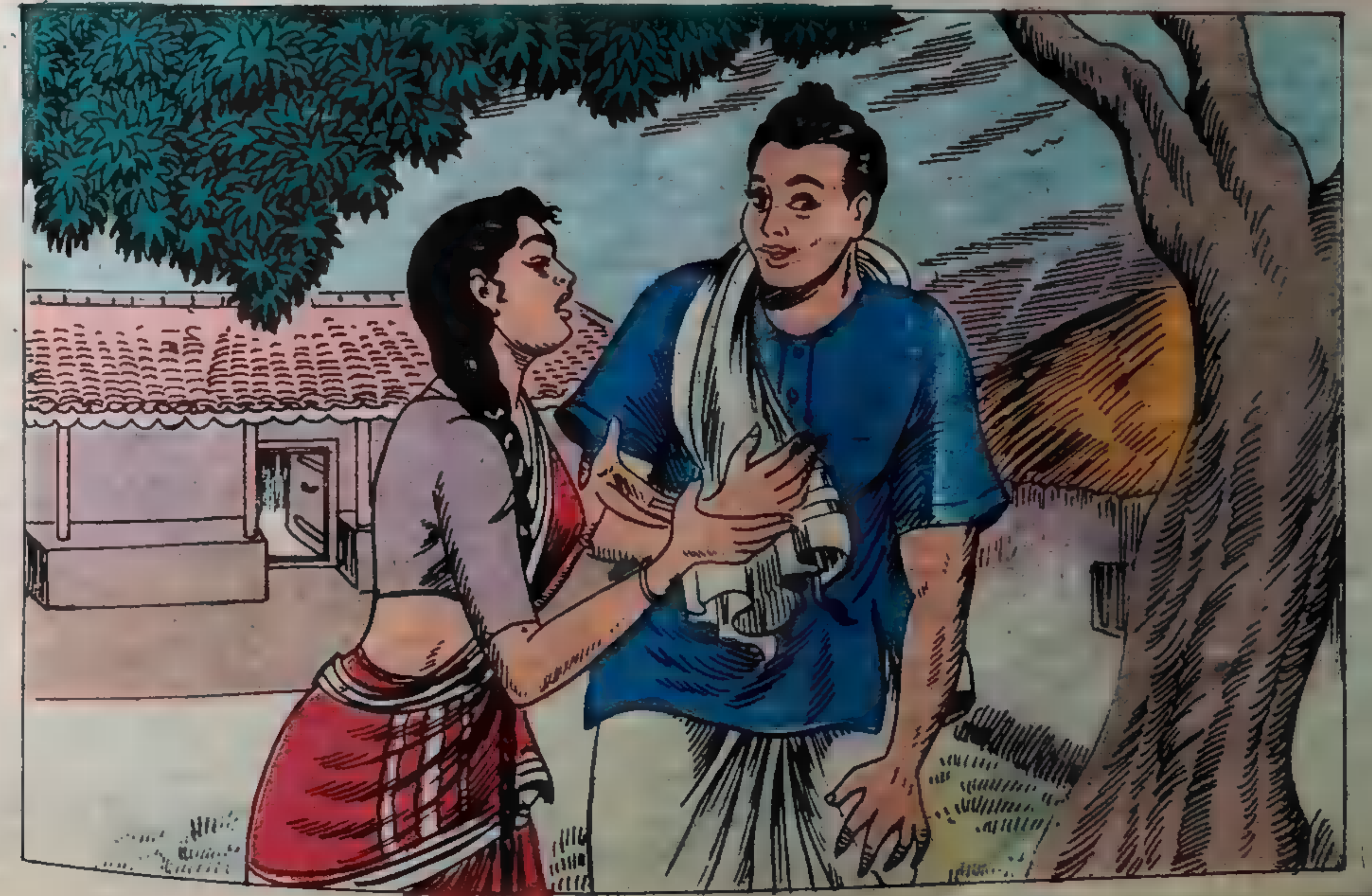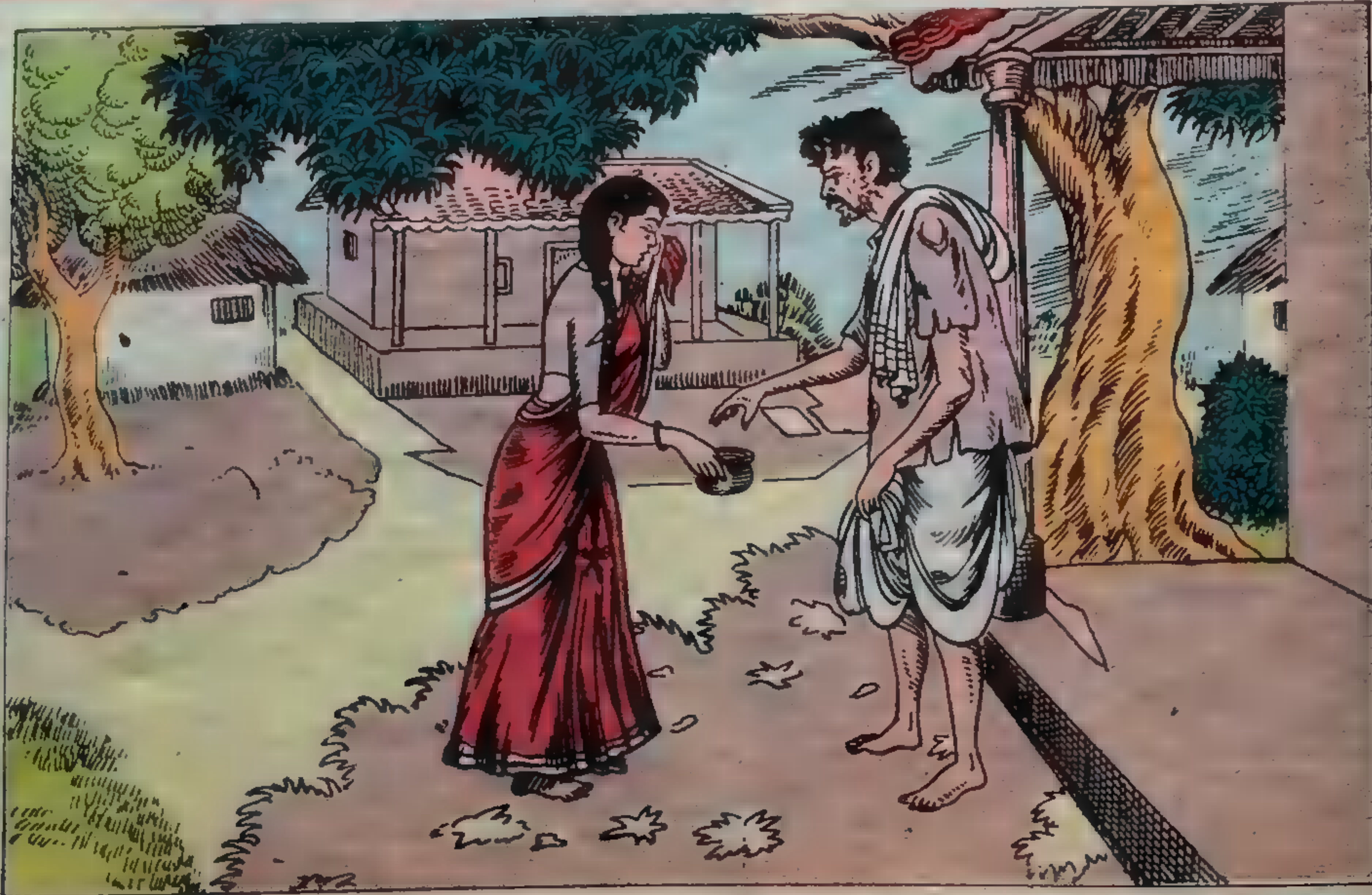
আমরা খুব গরীব।”

গঙ্গার স্বামী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, “বেচারা, এতদিন পরে এসেছে, তবুও তাকে আমরা আদর-যত্ন করব না? সে তো তোমায় মানুষ করেছে।”

“ও তোমার ভাই নয়, আমার। আমি যখন চাইছি না, তখন তোমার কেন এত দরদ?” গঙ্গার পাল্টা প্রশ্ন।

স্বামী ভাবল, একদিক থেকে তার স্ত্রী ঠিকই বলেছে। গঙ্গা স্বামীর জন্যও একটা পুরনো খাটিয়া বাইরে এনে পেতে দেয়। গঙ্গার স্বামী কি যে বলবে ভেবে না পেয়ে শুয়ে পড়ে খাটিয়ার উপর। এমন ভান করে যেন বড় শ্যালককে দেখতেই পায়নি।

সেদিনটা ছিল পরবের দিন। গঙ্গা ভালমন্দ খাবার তৈরী করেছে। দাদা না এসে পড়লে স্বামীকে নিয়ে গঙ্গা এতক্ষণে মজা করে খেতে বসত। গঙ্গার স্বামীর খিদেও পেয়েছে। কিন্তু চুপ করে শুয়ে থাকে এই আশায় যে, আরেকটু রাত হলেই স্ত্রী তাকে খাবার জন্য ডাকবে।

অনন্তের ঘুম আর আসছে না। একদিকে তার খিদের জ্বালা, অন্যদিকে বোনের দারিদ্র্য।

গঙ্গার স্বামীর অনন্তের উপর মায়া হয় বড্ড। কিন্তু সে তো নিজের স্ত্রীর এসব ভনিতা ভেঙে দিতে পারে না। রাত হয়ে যাচ্ছে, অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। অনন্তের আর ঘুম আসছে না। চুপচাপ পড়ে রয়েছে।

মধ্যরাতে গঙ্গা ছায়ার মত খাটিয়ার কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, “খেয়ে যাও এসে,” এবং বলেই চলে যায়। অনন্ত বোনের কথা শুনে মনে করল, স্বামীর ভয়ে সে তাকে ডেকে চুপিসারে খাওয়াতে চাইছে। কাপড়টা গায়ে-মুখে ঢাকা দিয়ে সে ভিতরে যায়।

খাবার সাজান রয়েছে। কেরোসিনের বাতির আলোয় ভাল বোঝা যাচ্ছে না, আলোটা আবার দুলছে। স্পষ্ট দেখাও যায় না।

“খাবার খেয়ে নাও। যদি আরো লাগে পাশেই সব আছে, নিয়ে নেবে।” বলে গঙ্গা অন্যদিকে চলে যায়। কারণ তার ধারণা,

কাপড়-ঢাকা দিয়ে তার স্বামীই এসেছে। দাদা ঘুমিয়ে পড়েছে পথের ক্লান্তিতে, স্বামীই জেগে ছিল। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে আর কিছু না বলে পুনরায় দরজার কাছে গিয়ে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে। দাদা জেগে উঠলেও বুঝবে না।

অনন্ত খাবার দেখে ভাবে, ‘আহা, বোন আমার জন্য কষ্ট করে কত কি রান্না করেছে।’ পেটভর্তি সে খায়। খাওয়ার শেষে হাত ধোয়। বোনের কথা মনে পড়ে, ‘যত চাও নিয়ে নেবে, সবই পাশে আছে।’ কাপড় বিছিয়ে সমস্ত ঢেলে নেয়। রান্না ছাড়াও রয়েছে চাল, ডাল এবং অনেক কিছু। কাপড়ে সমস্ত বেঁধে নেয়। বোনকে আর ডাকল না, কারণ বোনকে ডাকতে গেলে যদি তার স্বামীর ঘুম ভেঙে যায়। খুশিমনে পিছনদিকের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে চলে যায়।

খানিক বাদে খিদের জ্বালায় গঙ্গার স্বামীর ঘুম ভেঙে যায়। স্ত্রী তাকে খাবার জন্য ডাকেনি বলে অত্যন্ত রাগ হয়, চীৎকার করে ওঠে, “আরে, খাবার কোথায়?”

দরজায় হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছিল গঙ্গা। বলে, “খাবার তো খেলে, তবুও এত জোরে চীৎকার করছ কেন?”

গঙ্গার স্বামী আরো রেগে গিয়ে জোর এক ধাক্কা দেয় স্ত্রীকে।

এবার সব ফাঁস হয়ে যায়। গঙ্গা প্রশ্ন করে, “তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে কেন?”

রাগ চড়ে যায় মাথায়। “আমার যেমন ইচ্ছা তাই করব। ঘুম এলে তোমার হুকুমের জন্য বসে থাকব? কাল যদি আমার লোক আসে, তাহলে তাদের সঙ্গেও তুমি এরকম করবে? বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে। যে নিজের দাদাকে দেখতে পারে না, সে আবার আমার লোককে কি দেখবে?” গঙ্গাকে বাড়ীর বাইরে করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।

বাড়ী ফিরে এসে অনন্ত তার বোঁচকা খুলে দেখে, চালের সাথে অনেক টাকাও এসেছে। ভেবেচিন্তে ঐ টাকায় গাড়ী এবং বলদ কিনে সুখে দিন কাটায়।

ছোটদের জন্য ছোটদের খবর

নাবালক রাষ্ট্রদূত

গত ২৪ জুলাই হতে ৪ অগাস্ট জাপানের ফুকুওকা শহরে পঞ্চম এশিয়ান-প্যাসিফিক চিলড্রেন্স কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল যেখানে ভারতের ৮ জন সহ ৪০টি দেশের মোট ৩০০ জন শিশু প্রতিনিধি যোগ দেয়। এই সম্মেলনের আয়োজন করে 'জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল' এবং যোগদানকারী শিশু-প্রতিনিধিরা প্রত্যেকেই নিজের দেশের 'জেসিস্'-এর সদস্য। প্রত্যেকটি দেশ আটজন প্রতিনিধিকে প্রেরণ করতে পারে। ভারতীয় দলটির নেতৃত্ব দেয় মাদ্রাজের মোগাপ্লেয়ার অঞ্চলের ডি.এ.ভি. স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ১২বৎসর বয়স্ক ভি.গণেশরত্নম।

ফিরে এসে সর্বপ্রথমেই গণেশরত্নম 'চাঁদমামা'-র প্রধান কার্যালয়ে তার জাপান সফরের বর্ণনা দেয় ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলে, সেই সঙ্গে সেখানে তোলা ফোটোও দেখায়। তারা প্রত্যেকে জাপানী পরিবারের সঙ্গে থেকেছে; কয়েকটি জাপানী শব্দ শেখা এবং সেই পরিবারের ছোটদেরকে কয়েকটি ইংরাজী শব্দ শেখানো সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে ভাবের বিনিময় হয়েছে সাঙ্কেতিক ভাষায়। কোন অসুবিধা হয়নি, বেশ আনন্দে দিন কেটেছে তাদের। যোগদানকারীরা সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছে নিজেদের দেশের ঐতিহ্য অনুযায়ী, যেমন ভারতীয়রা করেছে লোকনৃত্য এবং ধ্রুপদ নৃত্য-সঙ্গীতের আসর। একদিন তারা দেশের রীতি অনুযায়ী পোশাক পরে, গণেশরত্নমের পোশাক ছিল অতি সাধারণ। ইকেবানা, জুডো এবং অরিগামি বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা যোগদানকারীদের দেওয়া হয়েছে সেখানে। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ! আমোদপ্রমোদ! হ্যাঁ, তাও হয়েছে—'গ্রীনল্যাণ্ড অ্যামিউজমেন্ট পার্ক', 'মেরিন ল্যাণ্ডস্', 'স্পেস ওয়ার্ল্ড', 'মিউজিয়াম', 'ডলফিন শো' এবং 'বুলেট ট্রেনে' ভ্রমণ।

সম্মেলনের শেষের দিনের যে প্রস্তাব তারা সকলে পাঠ করে, তখনও তার স্মৃতিতে স্পষ্ট ভাসছিল, "আমরা, এই অপরিণত-বয়স্ক রাষ্ট্রদূতগণ শপথ করছি যে আমাদের এই সুন্দর গ্রহটিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষা করব। আপন আপন দেশের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যকে অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্যই আমরা মিলিত হয়েছি। প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক সীমানা পেরিয়ে আজ আমরা সকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবেছি, আমাদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান করেছি। আমাদের জীবনের তটরেখা পেরিয়ে শান্তি, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের স্পর্শ অনুভব করছে আমাদের হৃদয়। বিশ্বে চিরস্থায়ী শান্তি ও ঐক্যের বন্ধনের জন্য আমরা আবেগপূর্ণ হৃদয়ে একত্রিত হয়ে বন্ধুত্বের অঙ্গীকার করছি।" যোগদানকারীদের বলা হয়েছে, "বিশ্বের 'মহাকাশযানের নাবিক' হচ্ছে এই নাবালকেরা, এদের মধ্যে ভবিষ্যতের নেতারূপে অনেককে দেখা যাবে এবং শান্তির জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসবে।" আমাদের আশা, গণেশরত্নমকে সত্যি আমরা নেতৃরূপে দেখতে পাব।

চার বৎসর বয়সেই মোটর চালনা

এমন কোন শিশু নেই যে গাড়ীর চালকের আসনে বসে স্টিয়ারিং হুইলটি ধরে নাড়াচাড়া করতে পছন্দ না করে। হায়দ্রাবাদের ছোট্ট জুহি সেরকমই একজন, বরং অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। গাড়ীতে বসে স্টার্ট দিয়ে হুইল ধরে অন্যান্য চালকদের মত গাড়ী চালিয়ে চলে যায়। পার্থক্য কেবল, জুহির বয়স মাত্র চার বৎসর। অন্যান্য শিশুদের মত তারও খেলার জন্য রয়েছে পুতুল এবং অন্যান্য সামগ্রী। দূর হতে নিয়ন্ত্রিত খেলনাতে উৎসাহ লক্ষ্য করে তার বাবা-মা তাকে গাড়ী চালান শেখান স্থির করে। তাকে 'ড্রাইভিং' স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ী চালনার সমস্ত কিছু শেখে, এমনকি গাড়ী চালাবার নিয়মকানুন পর্যন্ত। এখন সে ভালমতই গাড়ী চালাতে পারে। একটু বড় হলে মাকে নিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা তার। প্রমোদকুমার এবং বনিতার কন্যা জুহি তিন বৎসর বয়স হবার পূর্বেই সাঁতার শেখে এবং ১২ ফুট উচু থেকেও ঝাঁপ দিতে পারে।

ছোটদের জন্য আরেকটি সুখবর: মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়র ছোটদের জন্য বিশেষ ধরনের গাড়ীর নক্সা তৈরী করেছেন। 'টয়মটো' নামে ছোট্ট গাড়ীটি ৩৫ সিসি. পেট্রোল ইঞ্জিনে চলবে, ৮৫ কিগ্রা. পর্যন্ত ওজন নিতে পারবে এবং মূল্য হবে আনুমানিক ১৫,০০০ টাকা।

মিলেমিশে

কাশিপুরের অবস্থাপন্ন চাষী শেখর। একমাত্র সন্তান সুভদ্রা। কন্যার বিবাহের জন্য পুরোদমে প্রস্তুত হচ্ছে। দূর সম্পর্কের আত্মীয় শঙ্কর, তার পুত্র নরেন্দ্রকে শেখরের খুব পছন্দ। সবদিক দিয়েই তাকে যোগ্য বলে মনে হয়। খুব সম্পন্ন অবস্থা না হলেও ভালভাবেই চলে যায়। দুই একর জমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে, তাতেই চাষবাস করে। মা-বাবাকে দেখাশোনা করে।

কন্যার বিবাহের জন্য দেখাশোনা চলছে। শেখরের পত্নী পার্বতী বলে, "আমি বুঝতে পারছি না যে ওই নরেন্দ্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য তুমি কেন এত উঠেপড়ে লেগেছ? মাত্র দুই একর জমির উপর তাকে নির্ভর করতে হয়, আর কোন আয় তার নেই। এরকম মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ভাবছ আমাদের মেয়ে সুখে থাকবে? ও আমাদের একমাত্র সন্তান। তার ভবিষ্যতের চিন্তা আমরা না করলে কে করবে? আমার বান্ধবী দুর্গার পুত্র প্রতাপ বেশ সুন্দর। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক করলে আমাদের সমান হবে।"

পত্নীর কথায় হেসে উঠে বলল শেখর, "নরেন্দ্রও কম সুন্দর নয়। তারপর জমিজায়গার কথা। আমার সমস্ত জমিজমা, তা তো মেয়েরই হবে। স্বামী-স্ত্রীর মিলনেই একটা সুন্দর জিনিস গড়ে ওঠে। আর যদি থাকে তাদের মধ্যে ভাল বনিবনা, তাহলে আর কথাই নেই। নরেন্দ্রের স্বভাব-চরিত্র-ব্যবহার অন্যদের সঙ্গে তুলনা করে দেখেই বলছি, আমাদের মেয়ের জন্য সেই যোগ্য পাত্র।"

"তাহলে তুমি বলতে চাও যে, আমার বান্ধবীর পুত্র প্রতাপের স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়। সে বেশ ভদ্র এবং বুদ্ধিমান।" তিড়বিড়িয়ে বলে ওঠে পার্বতী।

শেখর হেসে উত্তর দেয়, "আমি মোটেই এরকম বলিনি। ঠিক আছে, নরেন্দ্র এবং প্রতাপের একটা পরীক্ষা নেব আমি, দেখব কে যোগ্য আমার মেয়ের জন্য। কি তুমি রাজী আমার এই প্রস্তাবে?"

পার্বতী মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায়। পরদিন শেখর প্রতাপকে ডেকে বলে, "পাশের গ্রামে হাট বসবে। আমি টাকা দিচ্ছি, ভাল দেখে একজোড়া বলদ পছন্দ করে নিয়ে এস। দেখবে, বলদটা যেন মোটামুটি শান্ত স্বভাবের হয়। নাহলে আমার ক্ষেতের কাজ ভালভাবে করা যাবে না। তাই বলছি, খুব সাবধানে দেখে শুনে নেবে।"

ভোরবেলাতেই প্রতাপ হাটের দিকে যাত্রা করে। হাটে অনেক বলদ, গরু বিক্রির জন্য আমদানী হয়েছে। অনেকক্ষণ ঘুরে সমস্ত দেখে বিক্রির দালালকে বলে, "বলদগুলো তো ভাল মনে হচ্ছে। কিন্তু এদের স্বভাব শান্তশিষ্ট তো? এরকম পেলে তবেই আমি কিনব।"

বিক্রেতারা প্রতাপের কথা শুনে হাসাহাসি করে বলে, এ কি বলদ কিনতে এসেছে না কি অন্য কিছু? পাগল নয় তো?

দ্বিপ্রহরের সময় প্রতাপ ফিরে এসে শেখরকে বলে, "হাটে বিক্রির জন্য অনেক বলদ এসেছে। আমি যখন বিক্রেতাদের বলি যে বলদগুলোর স্বভাব শান্তশিষ্ট কিনা, তখন তারা অবাক চোখে আমার দিকে তাকায়। ওদের ব্যবহার আমার বড্ড বাজে লেগেছে। যে খদ্দেরকে সম্মান করতে জানে না তার ব্যবসা চলবে কি

রাধিকারমণ ভট্টাচার্য

করে? বলদ না কিনেই আমি ফিরে এলাম।"

তখন শেখর নরেন্দ্রকে ডেকে একই কথা বলল যা সে প্রতাপকে বলেছিল। সেদিনই পরন্ত বেলায় একজোড়া বলদ নিয়ে এসে হাজির। দেখে মনে হচ্ছে, বলদগুলো ভালই।

শেখর সেগুলোকে দেখে খুশি হয়ে বলে, "বলদদুটোকে দেখে তুমি কি করে বুঝলে যে এরা একই জোয়ালে মিলেমিশে হাল টানবে?"

"সমস্ত জিনিস জেনেশুনেই আমি এই দুটোকে নিয়ে এসেছি," নরেন্দ্র আত্ম-বিশ্বাসের সাথে বলে।

দরজায় দাঁড়িয়ে পার্বতী সমস্ত শুনছিল, দেখছিল। ব্যঙ্গের স্বরে সে বলে ওঠে, "একটু বল কি করে বুঝতে পারলে যে এদের দিয়ে ভাল কাজ করা যাবে। আমরাও জানতে পারলে খুশি হব।"

উত্তরে নরেন্দ্র তখন বলে, "কেনার আগে এই দুটো বলদকে এক জোয়ালে জুড়ে বেত দিয়ে একটা বলদকে মারলাম খুব। মার খেয়ে ওটা যেই ছুট লাগায়, তখন অন্যটাও একই সঙ্গে দৌড় শুরু করে। একেই তো মিলেমিশে কাজ বলে, তাই না?" এই বলে সে বলদদুটোকে খুঁটির সাথে বাঁধার জন্য নিয়ে যায়।

মনে মনে খুব খুশি হয় পার্বতী। নরেন্দ্রকে সে দেখে আড়ালে গিয়ে। তখন শেখর তার কাছে এসে বলে, "দেখলে, প্রতাপ আর নরেন্দ্রের কি পার্থক্য। দেখ, সকলেই তো কথা শোনে। কিন্তু কথার মধ্যে প্রকৃত অর্থ কে ধরতে পারে? নরেন্দ্র কথার অর্থ বুঝতে পেরেছে; বুঝে নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করে কেমন সুন্দরভাবে কাজটা করল। প্রতাপের ভালমতন পরাজয় হল, নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।"

"আমি কি এটুকুও বুঝতে পারব না? এতই বোকা আমি! তোমাকে আর কে বাধা দিতে পারে, যাও নরেন্দ্রের সাথেই মেয়ের বিয়ে দাও।" পার্বতী খুশিতে বলে স্বামীকে।
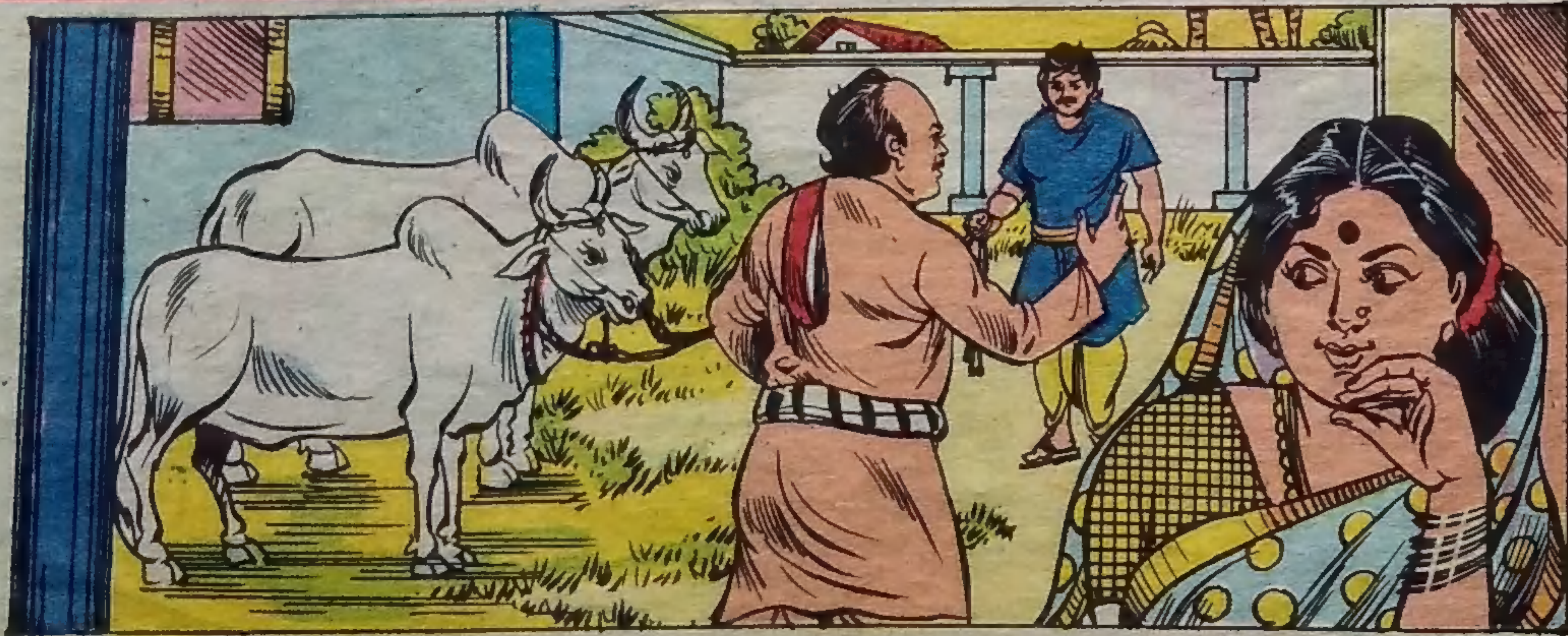
প্রাকৃতিক বিস্ময়

মৌমাছির জীবাশ্ম

পাঁচকোটি বৎসর পূর্বেও কি মৌমাছি ছিল? কয়েকজন জার্মান পুরাতত্ত্ববিদ অন্তত তাই বিশ্বাস করতে বলছেন কারণ, আইফেল অঞ্চলের এক শিলাস্তরে একটি ছোট্ট মৌমাছির জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন তাঁরা। তাঁদের মতে আবিষ্কৃত এ ধরনের জীবাশ্মের মধ্যে এটিই প্রাচীনতম। ৯ মিমি. লম্বা এই মৌমাছিটি সামান্য প্রভেদ ব্যতীত এখনকার মৌমাছির অনুরূপ।

ডাইনোসরের ডিম

চীন এবং আমেরিকা যথাক্রমে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ বৎসর এবং ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার ডাইনোসরের ডিম আবিষ্কার করেছে বলে দাবি করেছে। চীনের হেনান অঞ্চল হতে যে ডিমদুটি পাওয়া গেছে, সেদুটিকে জার্মানীতে হানোভারে অবস্থিত জীবাশ্ম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানার চেষ্টা করছেন যে এগুলির মধ্যে কোন ভ্রূণের জীবাশ্ম আছে কিনা। আমেরিকার ডেনভারে ভঙ্গুর অবস্থায় প্রাপ্ত ডিমের অভ্যন্তরে কালো হয়ে আছে, হয়তো সেটা ভ্রূণের জীবাশ্ম অথবা কুসুমের অবশিষ্টাংশ। পূর্বেও কোলোরাডো অঞ্চলে প্রাপ্ত ছয়টি ডাইনোসরের ডিমে এরকম দেখা গেছে। উটায় প্রাপ্ত ডিমটি মুরগীর ডিমের চেয়ে বড়।

তামিলনাড়ুতে ফ্রুট-ব্যাট

'গিনেস বুক অফ রেকর্ডস' অনুযায়ী পৃথিবীতে তিনপ্রকার দুর্লভজাতীয় বাদুড় আছে, তাদের মধ্যে 'ফ্রুট-ব্যাট' একটি। পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে পক্ষীবিশারদ এ.এফ.হটন তামিলনাড়ুর 'হাই ওয়েভি' পাহাড়ে এরকম একটি ফ্রুট-ব্যাট দেখতে পেয়ে ভেবেছিলেন ওটি সাধারণ একটি বাদুড়। সেটিকে তিনি বম্বের 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি'-তে নিয়ে এলে আরেকজন পক্ষী বিশারদ কিট্রি থঙ্গলঙ্গা সেটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানান এটি দুর্লভ জাতীয় বাদুড় এবং ভারতের বিখ্যাত পক্ষীবিশারদ ড. সেলিম আলির নামে নামকরণ করেন। সম্প্রতি এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত একজন বিজ্ঞানী এবং ব্রিটেনের হ্যারিসন জ্যুলজিকাল মিউজিয়ামের একজন একই অঞ্চলে আরেকটি অনুরূপ ফ্রুট-ব্যাটের দেখা পান। দুটি সংস্থাই গত দুই বৎসর যাবৎ বাদুড় নিয়ে গবেষণা করে চলেছে।

ফোটো-নামকরণ প্রতিযোগিতা : পুরস্কার ১০০ টাকা

পুরস্কৃত নাম ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে

N. Sambasiva Rao

M. Natarajan

● দুটো ফোটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই এবং নামকরণটি দু-চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই। ● দুটো ফোটোর নামকরণ শুধুমাত্র পোস্টকার্ডেই লিখে নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ● ২০ ডিসেম্বর '৯৩-এর মধ্যে এই কার্ড পৌছান চাই। ● চাঁদমামার যে-কোন পাঠক-পাঠিকা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন তবে প্রতিযোগীকেই পোস্টকার্ডটি লিখতে হবে নিজের বয়স উল্লেখ করে। ● জয়ী প্রতিযোগীকে ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

Chandamama Photo Caption Competition (Bengali),
Chandamama Buildings, Vadapalani, Madras 600026

অক্টোবর '৯৩ ফোটো-নামকরণ প্রতিযোগিতার ফল

প্রথম ফোটোর নাম : তরী বাঁধা ঘাটের কাছে
দ্বিতীয় ফোটোর নাম : কিশোর দুটি দাঁড়িয়ে আছে
পুরস্কার পেয়েছেন : লহরী ঘোষ, পূর্ব কাঁঠালি পাড়া, মাতৃভবন, পোঃ নৈহাটি, উত্তর চব্বিশপরগণা

[পুরস্কারের টাকা এই মাসের মধ্যেই পাঠানো হবে]

চাঁদমামা

ভারতে বাৎসরিক চাঁদা ৪৮.০০
নিচের ঠিকানায় চাঁদা পাঠাতে হবে:

Dolton Agencies, Chandamama Buildings,
Vadapalani, Madras 600026.

Printed by B.V. REDDI at Prasad Process Private Ltd., 188 N.S.K. Salai, Madras 600 026 (India) and Published by B. VISWANATHA REDDI on behalf of CHANDAMAMA PUBLICATIONS, Chandamama Buildings, Vadapalani, Madras 600 026 (India). Controlling Editor: NAGI REDDI.